ত্রয়োদশ অধ্যায়

প্রকৃতি-পুরুষ-বিবেকযোগ

শ্লোক ১-২

অর্জুন উবাচ

প্রকৃতিং পুরুষং চৈব ক্ষেত্রং ক্ষেত্রজ্ঞমেব চ ।
এতদ্ বেদিতুমিচ্ছামি জ্ঞানং জ্ঞেয়ং চ কেশব ॥ ১ ॥

শ্রীভগবানুবাচ

ইদং শরীরং কৌন্তেয় ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে ।
এতদ্ যো বেত্তি তং প্রাহুঃ ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি তদ্বিদঃ ॥ ২ ॥

অর্জুনঃ উবাচ—অর্জুন বললেন; **প্রকৃতিম্**—প্রকৃতি; **পুরুষম্**—পুরুষ; **চ**—ও; **এব**—অবশ্যই; **ক্ষেত্রম্**—ক্ষেত্র; **ক্ষেত্রজ্ঞম্**—ক্ষেত্রজ্ঞ; **এব**—অবশ্যই; **চ**—ও; **এতৎ**—এই সমস্ত; **বেদিতুম্**—জানতে; **ইচ্ছামি**—ইচ্ছা করি; **জ্ঞানম্**—জ্ঞান; **জ্ঞেয়ম্**—জ্ঞেয়; **চ**—ও; **কেশব**—হে কৃষ্ণ; **শ্রীভগবান্ উবাচ**—পরমেশ্বর ভগবান বললেন; **ইদম্**—এই; **শরীরম্**—শরীর; **কৌন্তেয়**—হে কুন্তীপুত্র; **ক্ষেত্রম্**—ক্ষেত্র; **ইতি**—এভাবে; **অভিধীয়তে**—অভিহিত হয়; **এতৎ**—এই; **যঃ**—যিনি; **বেত্তি**—জানেন; **তম্**—তাঁকে; **প্রাহুঃ**—বলা হয়; **ক্ষেত্রজ্ঞ**—ক্ষেত্রজ্ঞ; **ইতি**—এভাবে; **তদ্বিদঃ**—যিনি জানেন।

গীতার গান

অর্জুন কহিলেন ঃ

প্রকৃতির আর পুরুষ ক্ষেত্র যে ক্ষেত্রজ্ঞ ।
জানিবার ইচ্ছা মোর আমি নহি বিজ্ঞ ॥
সেইরূপ জ্ঞান আর বিজ্ঞান কি হয় ।
কেশব আমাকে কহ করিয়া নিশ্চয় ॥

শ্রীভগবান কহিলেন ঃ

হে কৌন্তেয়! এ শরীর ক্ষেত্র নাম তার ।
ইহার যে জ্ঞাতা সেই ক্ষেত্রজ্ঞ বিচার ॥

অনুবাদ

অর্জুন বললেন—হে কেশব! আমি প্রকৃতি, পুরুষ, ক্ষেত্র, ক্ষেত্রজ্ঞ, জ্ঞান ও জ্ঞেয়—এই সমস্ত তত্ত্ব জানতে ইচ্ছা করি।

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—হে কৌন্তেয়! এই শরীর ক্ষেত্র নামে অভিহিত এবং যিনি এই শরীরকে জানেন, তাঁকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলা হয়।

তাৎপর্য

অর্জুন প্রকৃতি, পুরুষ, ক্ষেত্র, ক্ষেত্রজ্ঞ, জ্ঞান ও জ্ঞেয়র বিষয় সম্বন্ধে জানতে আগ্রহী হয়েছিলেন। এই সম্বন্ধে তিনি যখন শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে বললেন যে, এই দেহকে বলা হয় ক্ষেত্র এবং যিনি এই ক্ষেত্র সম্বন্ধে জ্ঞাত তাঁকে বলা হয় ক্ষেত্রজ্ঞ। এই দেহ হচ্ছে বদ্ধ জীবের কর্মক্ষেত্র। বদ্ধ জীব মাত্রই জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে জড়া প্রকৃতির উপরে আধিপত্য করার চেষ্টা করে। আর তাই, জড়া প্রকৃতির উপর আধিপত্য করার ক্ষমতা অনুসারে সে একটি কর্মক্ষেত্র প্রাপ্ত হয়। সেই কর্মক্ষেত্রটি হচ্ছে তার দেহ। এই দেহটি কি? দেহটি ইন্দ্রিয়গুলি দিয়ে তৈরি। বদ্ধ জীব ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করতে চায় এবং তার ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করার ক্ষমতা অনুসারে সে একটি শরীর বা কর্মক্ষেত্র প্রাপ্ত হয়। তাই শরীরকে বলা হয় ক্ষেত্র অথবা বদ্ধ জীবের কর্ম করার ক্ষেত্র। এখন, যে ব্যক্তি তার দেহের প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে জ্ঞাত তাকে বলা হয় ক্ষেত্রজ্ঞ। ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ এবং দেহ ও দেহের জ্ঞাতা এদের পার্থক্য বুঝতে পারা খুব একটা কঠিন নয়।

যে কেউই বিবেচনা করে দেখতে পারেন যে, শৈশব থেকে বার্ধক্য পর্যন্ত তার দেহে কত পরিবর্তন দেখা যায়, কিন্তু তবুও দেহের যে দেহী তাঁর কোন পরিবর্তন হয় না। তিনি সব সময় একই থাকেন। এভাবেই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের পার্থক্য উপলব্ধি করা যায়। এভাবেই বদ্ধ জীব বুঝতে পারে যে, সে তার দেহ থেকে ভিন্ন। *ভগবদ্গীতার* প্রথম দিকেই বর্ণনা করা হয়েছে, *দেহিনোঽস্মিন্* অর্থাৎ দেহের দেহী আছে এবং দেহ কৌমার থেকে যৌবনে এবং যৌবন থেকে বার্ধক্যে পরিবর্তন হচ্ছে এবং যে ব্যক্তি এই দেহের মালিক তিনি জানেন যে, দেহের পরিবর্তন হচ্ছে। দেহের এই মালিকই হচ্ছেন ক্ষেত্রজ্ঞ। কখনও আমরা মনে করে থাকি যে, "আমি সুখী," "আমি একটি পুরুষ", "আমি একটি মহিলা," "আমি একটি কুকুর", "আমি একটি বেড়াল।" এগুলি হচ্ছে ক্ষেত্রজ্ঞের দেহগত উপাধি। কিন্তু ক্ষেত্রজ্ঞ দেহ থেকে ভিন্ন। যদিও আমরা অনেক জিনিস ব্যবহার করে থাকি, যেমন আমাদের কাপড় চোপড় আদি। আমরা একটু ভাবলেই বুঝতে পারি যে, এই সমস্ত ব্যবহৃত জিনিসগুলি থেকে আমরা স্বতন্ত্র। তেমনই, একটু চিন্তা করার ফলে আমরা বুঝতে পারি যে, আমাদের দেহ থেকে আমরা স্বতন্ত্র। দেহের মালিক আমি, তুমি অথবা যে কেউই হচ্ছি ক্ষেত্রজ্ঞ এবং দেহটিকে বলা হয় ক্ষেত্র বা কর্মক্ষেত্র।

ভগবদ্গীতার প্রথম ছয়টি অধ্যায়ে দেহের জ্ঞাতা বা জীব এবং তার স্থিতি, যার দ্বারা সে পরমেশ্বর ভগবানকে জানতে পারে, তা বর্ণিত হয়েছে। *ভগবদ্গীতার* মধ্যবর্তী ছয়টি অধ্যায়ে পরমেশ্বর ভগবান এবং ভক্তিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে জীবাত্মা ও পরমাত্মার সম্পর্ক বর্ণিত হয়েছে। পরমেশ্বর ভগবানের পরমপদ এবং তাঁর নিত্য সেবকরূপে জীবের যে স্বাভাবিক স্বরূপ তা এই অধ্যায়গুলিতে সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। জীব সর্ব অবস্থাতেই অধীনতত্ত্ব, কিন্তু ভগবানকে ভুলে যাওয়ার ফলে তারা দুঃখকষ্ট ভোগ করছে। শুভ কর্ম বা সুকৃতির প্রভাবে যখন তাঁদের চেতনার উন্মেষ হয়, তখন তাঁরা আর্ত, অর্থার্থী, জিজ্ঞাসু ও জ্ঞানীরূপে ভগবানের অনুগামী হন। সেই কথাও বর্ণিত হয়েছে। এখন ত্রয়োদশ অধ্যায় থেকে বর্ণনা করা হচ্ছে জীব কিভাবে জড় জগতের সংস্পর্শে আসে এবং ভগবানের কৃপার প্রভাবে সে কিভাবে কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তির মাধ্যমে জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়, সেই সমস্ত বিষয়ে এখানে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। জীব যদিও তাঁর জড় দেহ থেকে সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন, তবুও সে তার জড় দেহের সঙ্গে কোন না কোনভাবে সম্পর্কিত হয়ে পড়ে। সেই কথাও এখানে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

শ্লোক ৩

ক্ষেত্রজ্ঞং চাপি মাং বিদ্ধি সর্বক্ষেত্রেষু ভারত ।
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োর্জ্ঞানং যত্তজ্জ্ঞানং মতং মম ॥ ৩ ॥

ক্ষেত্রজ্ঞম্—ক্ষেত্রজ্ঞ; **চ**—ও; **অপি**—অবশ্যই; **মাম্**—আমাকে; **বিদ্ধি**—জানবে; **সর্ব**—সমস্ত; **ক্ষেত্রেষু**—ক্ষেত্রে; **ভারত**—হে ভারত; **ক্ষেত্র**—ক্ষেত্র (শরীর); **ক্ষেত্রজ্ঞয়োঃ**—ক্ষেত্রজ্ঞ; **জ্ঞানম্**—জ্ঞান; **যৎ**—যে; **তৎ**—সেই; **জ্ঞানম্**—জ্ঞান; **মতম্**—অভিমত; **মম**—আমার।

গীতার গান

আমিও ক্ষেত্রজ্ঞ বুঝ সকল শরীরে ।
হে ভারত, অন্তর্যামী কহে সে আমারে ॥
সেই ক্ষেত্র আর ক্ষেত্রজ্ঞের যেবা জ্ঞান ।
আমার বিচারে হয় সেই শুদ্ধ জ্ঞান ॥

অনুবাদ

হে ভারত! আমাকেই সমস্ত ক্ষেত্রের ক্ষেত্রজ্ঞ বলে জানবে এবং ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ সম্বন্ধে যে জ্ঞান, সেই জ্ঞানই আমার অভিমত।

তাৎপর্য

আমরা যখন দেহ ও দেহের জ্ঞাতা, আত্মা ও পরমাত্মা সম্বন্ধে আলোচনা করি, তখন আমরা তিনটি আলোচনার বিষয় দেখতে পাই—ভগবান, জীব ও জড় পদার্থ। প্রতিটি কর্মক্ষেত্রে বা প্রতিটি দেহে দুটি আত্মা আছে—জীবাত্মা ও পরমাত্মা। যেহেতু পরমাত্মা হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণেরই প্রকাশ, তাই শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, "আমিও ক্ষেত্রজ্ঞ, কিন্তু আমি দেহের অণু ক্ষেত্রজ্ঞ নই, আমি হচ্ছি পরম ক্ষেত্রজ্ঞ। পরমাত্মা রূপে আমি প্রতিটি শরীরেই অবস্থান করি।"

কেউ যদি *ভগবদ্গীতার* পরিপ্রেক্ষিতে কর্মক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অধ্যয়ন করেন, তা হলে তিনি জ্ঞান লাভ করতে পারবেন।

ভগবান বলছেন, "আমি প্রতিটি দেহের ক্ষেত্রজ্ঞ।" জীবাত্মা তার নিজের দেহের ক্ষেত্রজ্ঞ হতে পারে, কিন্তু অন্য শরীর সম্বন্ধে তার কোন জ্ঞান নেই। পরমেশ্বর ভগবান যিনি পরমাত্মা রূপে প্রত্যেক শরীরে বর্তমান, তিনি সমস্ত শরীর সম্বন্ধে

সর্বতোভাবে অবগত। তিনি দেবতা, মানুষ, পশু, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষ, লতা আদি সমস্ত প্রজাতির শরীর সম্বন্ধেই সর্বতোভাবে অবগত। কোন নাগরিক যেমন শুধু তার নিজের জমিটি সম্বন্ধেই অবগত, কিন্তু রাজা কেবল তাঁর রাজপ্রাসাদ সম্বন্ধেই অবগত নন, তিনি তাঁর রাজ্যের প্রতিটি নাগরিকের সমস্ত সম্পত্তি সম্বন্ধেও অবগত। তেমনই, কেউ তাঁর নিজের দেহের মালিক হতে পারেন, কিন্তু পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন সমস্ত শরীরের মালিক। রাজা হচ্ছেন তাঁর রাজ্যের মুখ্য মালিক এবং নাগরিকেরা হচ্ছেন গৌণ মালিক। তেমনই, পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন সমস্ত শরীরের মুখ্য মালিক।

দেহ গঠিত হয় ইন্দ্রিয়গুলি দিয়ে। পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন হৃষীকেশ, যার অর্থ হচ্ছে 'সমস্ত ইন্দ্রিয়ের নিয়ন্তা'। রাজা যেমন রাজ্যের সমস্ত কার্যকলাপের মুখ্য নিয়ন্তা এবং তাঁর প্রজারা হচ্ছে গৌণ নিয়ন্তা, তেমনই পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন সমস্ত ইন্দ্রিয়ের প্রধান নিয়ন্তা। ভগবান বলেছেন, "আমিও ক্ষেত্রজ্ঞ"। এর অর্থ হচ্ছে যে, তিনি হচ্ছেন পরম ক্ষেত্রজ্ঞ; জীবাত্মা কেবল তার নিজের শরীরটির ক্ষেত্রজ্ঞ। বৈদিক শাস্ত্রে বলা হয়েছে—

ক্ষেত্রাণি হি শরীরাণি বীজং চাপি শুভাশুভে ।
তানি বেত্তি স যোগাত্মা ততঃ ক্ষেত্রজ্ঞ উচ্যতে ॥

এই দেহকে বলা হয় ক্ষেত্র এবং এই দেহের মধ্যেই বাস করেন দেহের মালিক। পরমেশ্বর ভগবান এই দেহ ও দেহের মালিক উভয়কেই জানেন। তাই, তাঁকে সর্বক্ষেত্রের ক্ষেত্রজ্ঞ বলা হয়। এভাবেই কর্মক্ষেত্র, ক্ষেত্রজ্ঞ ও পরম ক্ষেত্রজ্ঞের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করা হয়েছে। দেহের স্বরূপ, জীবাত্মার স্বরূপ ও পরমাত্মার স্বরূপ সম্বন্ধে পূর্ণজ্ঞানকে বৈদিক শাস্ত্রে জ্ঞান বলা হয়েছে। সেটিই হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের মত। জীবাত্মা এবং পরমাত্মাকে এক কিন্তু তবুও স্বতন্ত্র বলে বুঝতে পারাটাই হচ্ছে জ্ঞান। যিনি ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ সম্বন্ধে অবগত নন, তিনি যথার্থ জ্ঞান প্রাপ্ত হননি। প্রকৃতি, পুরুষ এবং প্রকৃতি ও পুরুষের পরম নিয়ন্তা পরম ক্ষেত্রজ্ঞ ঈশ্বর সম্বন্ধে আমাদের জানতে হবে। এই তিনের বিশেষত্ব সম্বন্ধে বিভ্রান্ত হওয়া উচিত নয়। চিত্রকার, চিত্র ও চিত্র অঙ্কনের ফলক সম্বন্ধে বিভ্রান্ত হওয়া উচিত নয়। এই জড় জগৎ, যা হচ্ছে কর্মক্ষেত্র, তা হচ্ছে প্রকৃতি আর এর ভোক্তা হচ্ছে জীব এবং এই উভয়ের ঊর্ধ্বে পরম নিয়ন্তা হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান। বৈদিক শাস্ত্রে (*শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে* ১/১২) বলা হয়েছে—*ভোক্তা ভোগ্যং প্রেরিতারং চ মত্বা/ সর্বং প্রোক্তং ত্রিবিধং ব্রহ্মমেতৎ*। ব্রহ্মকে তিনভাবে উপলব্ধি করা যায়—কর্মক্ষেত্র রূপে প্রকৃতিই হচ্ছে ব্রহ্ম, জীবও ব্রহ্ম এবং সে জড়া প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করবার

চেষ্টা করছে এবং এই উভয়েরই নিয়ন্তাও হচ্ছেন ব্রহ্ম, কিন্তু তিনিই হচ্ছেন প্রকৃত নিয়ন্তা।

এই অধ্যায়ে বিশেষভাবে ব্যাখ্যা করা হবে যে, এই দুই ক্ষেত্রজ্ঞের মধ্যে একজন হচ্ছেন ভ্রান্ত এবং অপর জন অভ্রান্ত। একজন ঊর্ধ্বতন, অপর জন অধস্তন। যারা মনে করে যে, এই উভয় ক্ষেত্রজ্ঞই এক এবং অভিন্ন, তারা পরমেশ্বর ভগবানের বিরুদ্ধাচরণ করে। এখানে তিনি অতি স্পষ্টভাবে বলেছেন, "আমিও ক্ষেত্রজ্ঞ", রজ্জুকে যার সর্প ভ্রম হয়, তার যথার্থ জ্ঞান নেই। ভিন্ন ভিন্ন শরীর আছে এবং সেই সমস্ত শরীরে ভিন্ন ভিন্ন শরীরী বা মালিক আছেন। যেহেতু প্রতিটি স্বতন্ত্র আত্মার এই জড় জগতের উপর আধিপত্য করার ব্যক্তিগত ক্ষমতা আছে, তাই তাদের ভিন্ন ভিন্ন শরীর আছে। কিন্তু পরম নিয়ন্তারূপে পরমেশ্বর ভগবানও সেই সমস্ত শরীরে বর্তমান। *চ* শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ, কেন না তার মাধ্যমে সমস্ত শরীরকে উল্লেখ করা হয়েছে। সেটিই হচ্ছে শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণের অভিমত। প্রতিটি শরীরে আত্মা ছাড়াও পরমাত্মা রূপে শ্রীকৃষ্ণ রয়েছেন। শ্রীকৃষ্ণ এখানে স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, কর্মক্ষেত্র ও তার সীমিত ভোক্তা উভয়েরই নিয়ন্তা হচ্ছেন পরমাত্মা।

শ্লোক ৪

তৎ ক্ষেত্রং যচ্চ যাদৃক্ চ যদ্বিকারি যতশ্চ যৎ ।
স চ যো যৎপ্রভাবশ্চ তৎ সমাসেন মে শৃণু ॥ ৪ ॥

তৎ—সেই; **ক্ষেত্রম্**—ক্ষেত্র; **যৎ**—যা; **চ**—ও; **যাদৃক্**—যে রকম; **চ**—ও; **যৎ**—যেরূপ; **বিকারি**—বিকার; **যতঃ**—যার থেকে; **চ**—ও; **যৎ**—যা; **সঃ**—তিনি; **চ**—ও; **যঃ**—যিনি; **যৎ**—যেরূপ; **প্রভাবঃ**—প্রভাব; **চ**—ও; **তৎ**—সেই; **সমাসেন**—সংক্ষেপে; **মে**—আমার থেকে; **শৃণু**—শ্রবণ কর।

গীতার গান

সেই ক্ষেত্র আর ক্ষেত্রজ্ঞের বিচার ।
কি তার স্বরূপ কিংবা কি তার বিচার ॥
কি তার প্রভাব কিংবা কোথা হতে হয় ।
শুন তুমি কহি আমি করিয়া নিশ্চয় ॥

অনুবাদ

সেই ক্ষেত্র কি, তার কি প্রকার, তার বিকার কি, তা কার থেকে উৎপন্ন হয়েছে, সেই ক্ষেত্রজ্ঞের স্বরূপ কি এবং তার প্রভাব কি, সেই সব সংক্ষেপে আমার কাছে শ্রবণ কর।

তাৎপর্য

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এখানে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের স্বরূপ বর্ণনা করেছেন। এই শরীর কিভাবে গঠিত হয়েছে, তার গঠনের উপাদানগুলি কি, কার নিয়ন্ত্রণাধীনে এই শরীর কাজ করে চলেছে, কিভাবে তার পরিবর্তন হচ্ছে, কোথা থেকে এই পরিবর্তনগুলি আসছে, তার কারণ কি, তার উদ্দেশ্য কি, প্রতিটি স্বতন্ত্র আত্মার পরম লক্ষ্য কি এবং স্বতন্ত্র আত্মার প্রকৃত রূপ কি, সেই সম্বন্ধে জানতে হবে। জীবাত্মা ও পরমাত্মার পার্থক্য, তাঁদের বিভিন্ন প্রভাব এবং তাঁদের শক্তি আদি সম্বন্ধে জানতে হবে। পরমেশ্বর ভগবানের বর্ণনা অনুসারে সরাসরিভাবে এই *ভগবদ্গীতা* উপলব্ধি করতে হবে, তখন সমস্ত প্রশ্নের উত্তর হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব হবে। কিন্তু আমাদের সতর্ক হতে হবে, সকলের দেহে অবস্থিত পরমেশ্বর ভগবানকে জীবাত্মার সঙ্গে এক বলে যেন মনে না করি। এটি অনেকটা শক্তিমান ও শক্তিহীনকে সমান বলে মনে করারই সামিল।

শ্লোক ৫

ঋষিভির্বহুধা গীতং ছন্দোভির্বিবিধৈঃ পৃথক্ ।
ব্রহ্মসূত্রপদৈশ্চৈব হেতুমদ্ভির্বিনিশ্চিতৈঃ ॥ ৫ ॥

ঋষিভিঃ—ঋষিগণ কর্তৃক; **বহুধা**—বহু প্রকারে; **গীতম্**—বর্ণিত হয়েছে; **ছন্দোভিঃ**—বৈদিক ছন্দের দ্বারা; **বিবিধৈঃ**—বিবিধ; **পৃথক্**—পৃথকভাবে; **ব্রহ্মসূত্র**—বেদান্তের; **পদৈঃ**—সূত্রের দ্বারা; **চ**—ও; **এব**—অবশ্যই; **হেতুমদ্ভিঃ**—যুক্তিযুক্ত; **বিনিশ্চিতৈঃ**—নিশ্চিতভাবে।

গীতার গান

দার্শনিক ঋষি কত করেছে বিচার ।
স্মৃতি ছন্দে কত বলে নাহি তার পার ॥

কিন্তু বেদান্ত বাক্যে যুক্তির সহিত ।
যে বিচার করিয়াছে লাগি লোকহিত ॥
সেই সে বিচার জান সুসিদ্ধান্ত মত ।
সকলের গ্রহণীয় ছাড়ি অন্য পথ ॥

অনুবাদ

এই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের জ্ঞান ঋষিগণ কর্তৃক বিবিধ বেদবাক্যের দ্বারা পৃথক পৃথকভাবে বর্ণিত হয়েছে। বেদান্তসূত্রে তা বিশেষভাবে যুক্তিযুক্ত সিদ্ধান্ত সহকারে বর্ণিত হয়েছে।

তাৎপর্য

এই তত্ত্বজ্ঞান বিশ্লেষণ করার ব্যাপারে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষক। তবুও চিরাচরিত প্রথা অনুসারে, পণ্ডিত ও আচার্যেরা সর্বদাই পূর্বতন আচার্যদের নজির দিয়ে থাকেন। আত্মা ও পরমাত্মা সম্পর্কে অত্যন্ত বিতর্কমূলক দ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য প্রামাণ্য গ্রন্থ *বেদান্ত* শাস্ত্রের উল্লেখ করেছেন। প্রথমে তিনি বিভিন্ন ঋষিদের মতের উল্লেখ করেছেন। সমস্ত ঋষিদের মধ্যে *বেদান্ত-সূত্রের* প্রণেতা ব্যাসদেব হচ্ছেন মহর্ষি এবং *বেদান্ত-সূত্রে* দ্বৈতবাদকে পূর্ণরূপে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ব্যাসদেবের পিতা পরাশর মুনিও ছিলেন একজন মহর্ষি এবং তাঁর প্রণীত ধর্মশাস্ত্রে তিনি লিখেছেন, *অহং ত্বং চ তথান্যে*....“আমরা, আপনি, আমি এবং অন্য সমস্ত জীব—জড় দেহে থাকলেও জড়াতীত। এখন আমরা আমাদের বিভিন্ন কর্ম অনুসারে জড় জগতের তিনটি গুণের মধ্যে পতিত হয়েছি। তার ফলে, কেউ উচ্চ স্তরে আছে, আবার কেউ নিম্ন স্তরে। অজ্ঞানতার ফলে উচ্চ ও নিম্ন প্রকৃতি বিদ্যমান হয় এবং অগণিত জীবের মধ্যে তা প্রকাশিত হচ্ছে। কিন্তু পরমাত্মা, যিনি অচ্যুত, তিনি কখনই তিন গুণের দ্বারা কলুষিত হন না এবং তিনি হচ্ছেন গুণাতীত।” তেমনই, আদি *বেদে,* বিশেষ করে *কঠ উপনিষদে* আত্মা, পরমাত্মা ও দেহের পার্থক্য নিরূপণ করা হয়েছে। বহু মুনি-ঋষি এর ব্যাখ্যা করেছেন এবং পরাশর মুনিকে তাঁদের মধ্যে প্রধান বলে গণ্য করা হয়ে থাকে।

ছন্দোভিঃ শব্দটির দ্বারা বিভিন্ন বৈদিক শাস্ত্রাদিকে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন, *যজুর্বেদের* একটি শাখা *তৈত্তিরীয় উপনিষদে* প্রকৃতি, জীবসত্তা ও পরম পুরুষোত্তম ভগবানের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

আগেই বলা হয়েছে, *ক্ষেত্র* বলতে বোঝায় কর্মের ক্ষেত্র এবং দুই ধরনের *ক্ষেত্রজ্ঞ* আছেন—স্বতন্ত্র জীবাত্মা ও পরম আত্মা। *তৈত্তিরীয় উপনিষদে* (২/৯) বলা হয়েছে—*ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা*। পরমেশ্বর ভগবানের 'অন্নময়' নামে একটি শক্তির প্রকাশ হয়, যার ফলে জীব তার জীবন ধারণের জন্য অন্নের উপর নির্ভর করে। এটি পরমেশ্বর সম্বন্ধে একটি জড় উপলব্ধি। তারপর 'প্রাণময়', অর্থাৎ অন্নের মধ্যে পরমেশ্বরকে উপলব্ধি করার পর প্রাণের লক্ষণের মধ্যে তাঁকে উপলব্ধি করা। প্রাণময় লক্ষণের অতীত 'জ্ঞানময়' উপলব্ধি চিন্তা, অনুভূতি ও ইচ্ছা পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। তারপর ব্রহ্ম-উপলব্ধিকে বলা হয় 'বিজ্ঞানময়,' যার ফলে জীবের মন ও প্রাণের লক্ষণগুলি থেকে জীবকে স্বতন্ত্র বলে উপলব্ধি করা যায়। তার পরে পরম স্তর হচ্ছে 'আনন্দময়' অর্থাৎ সর্ব আনন্দময় প্রকৃতির উপলব্ধি। ব্রহ্ম-উপলব্ধির এই পাঁচটি স্তর আছে, যাকে বলা হয় *ব্রহ্ম পুচ্ছম্*। এর মধ্যে প্রথম তিনটি—অন্নময়, প্রাণময় ও জ্ঞানময় জীবের কর্মক্ষেত্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। এই সমস্ত কর্মক্ষেত্রের ঊর্ধ্বে হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান, যাঁকে বলা হয় 'আনন্দময়'। *বেদান্ত-সূত্রেও* পরমেশ্বর ভগবানকে বলা হয়েছে *আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ*—পরমেশ্বর ভগবান স্বভাবতই আনন্দময়। তাঁর সেই দিব্য আনন্দ উপভোগ করার জন্য তিনি নিজে বিজ্ঞানময়, প্রাণময়, জ্ঞানময় ও অন্নময়রূপে প্রকাশিত হন। কর্ম করবার এই ক্ষেত্রে জীবকে ভোক্তা বলে মনে করা হয় এবং আনন্দময় তার থেকে ভিন্ন। অর্থাৎ, জীব যদি আনন্দময়ের সেবায় ব্রতী হয়ে তাঁর সঙ্গে যুক্ত হয়ে আনন্দ লাভের প্রয়াসী হয়, তা হলেই তাঁর অস্তিত্ব সার্থক হয়। পরম ক্ষেত্রজ্ঞরূপে, জীবের অধস্তন ক্ষেত্রজ্ঞরূপে এবং কর্মক্ষেত্রের প্রকৃতিরূপে পরমেশ্বর ভগবানের এই হচ্ছে প্রকৃত আলেখ্য। এই তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করার জন্য *বেদান্তসূত্র* কিংবা *ব্রহ্মসূত্রের* অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে হয়।

এখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, *ব্রহ্মসূত্রের* অনুশাসনগুলি কার্য-কারণ অনুসারে অতি সুচারুভাবে সাজানো আছে। কতকগুলি সূত্র হচ্ছে—*ন বিয়দ্ অশ্রুতেঃ* (২/৩/২), *নাত্মা শ্রুতেঃ* (২/৩/১৮) এবং *পরাৎ তু তচ্ছ্রুতেঃ* (২/৩/৪০)। প্রথম সূত্রটিতে কর্মক্ষেত্রের কথা বলা হয়েছে, দ্বিতীয়টিতে জীবসত্তার কথা বলা হয়েছে এবং তৃতীয়টিতে বিবিধ সত্তার সকল প্রকার অভিপ্রকাশের আশ্রয় পরমেশ্বর ভগবানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

শ্লোক ৬-৭

মহাভূতান্যহঙ্কারো বুদ্ধিরব্যক্তমেব চ ।
ইন্দ্রিয়াণি দশৈকং চ পঞ্চ চেন্দ্রিয়গোচরাঃ ॥ ৬ ॥

ইচ্ছা দ্বেষঃ সুখং দুঃখং সংঘাতশ্চেতনা ধৃতিঃ ।
এতৎ ক্ষেত্রং সমাসেন সবিকারমুদাহৃতম্ ॥ ৭ ॥

মহাভূতানি—মহাভূতসমূহ; **অহঙ্কারঃ**—অহঙ্কার; **বুদ্ধিঃ**—বুদ্ধি; **অব্যক্তম্**—অব্যক্ত; **এব**—অবশ্যই; **চ**—ও; **ইন্দ্রিয়াণি**—ইন্দ্রিয়সমূহ; **দশৈকম্**—একাদশ; **চ**—ও; **পঞ্চ**—পাঁচ; **চ**—ও; **ইন্দ্রিয়গোচরাঃ**—ইন্দ্রিয়ের বিষয়; **ইচ্ছা**—ইচ্ছা; **দ্বেষঃ**—দ্বেষ; **সুখম্**—সুখ; **দুঃখম্**—দুঃখ; **সংঘাতঃ**—সমষ্টি; **চেতনা**—চেতনা; **ধৃতিঃ**—ধৈর্য; **এতৎ**—এই সমস্ত; **ক্ষেত্রম্**—ক্ষেত্র; **সমাসেন**—সংক্ষেপে; **সবিকারম্**—বিকারযুক্ত; **উদাহৃতম্**—বর্ণিত হল।

গীতার গান

ক্ষিতি, অপ, তেজ, বায়ু, ব্যোম মহাভূত ।
অহঙ্কার, বুদ্ধি আর মন অব্যক্ত সম্ভূত ॥
চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক যাহা জানি ।
পায়ু, পাদ, পেট, লিঙ্গ আর যাহা পাণি ॥
সেই দশ বাহ্য—আর মন সে অন্তরে ।
একাদশ ইন্দ্রিয় সে শাস্ত্রের বিচারে ॥
রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ যে বিষয় ।
চব্বিশ সে তত্ত্ব বুঝ ক্ষেত্র পরিচয় ॥
ইহাদের যে বিচার করে বিশ্লেষণে ।
ক্ষেত্রতত্ত্ব সেই বিজ্ঞ ভালরূপ জানে ॥
ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ আর যে সঙ্ঘাত ।
স্থূল দেহ পরিমাণ পঞ্চ মহাভূত ॥
চেতনা শক্তি যে হয় জীবের আধার ।
তার সঙ্গে ধৃতি জান ক্ষেত্রের বিকার ॥
অতএব এই সব একত্রে সে ক্ষেত্র ।
স্থূল সূক্ষ্ম জড় বিদ্যা সেই যে সর্বত্র ॥

অনুবাদ

পঞ্চ-মহাভূত, অহঙ্কার, বুদ্ধি, অব্যক্ত, দশ ইন্দ্রিয় ও মন, ইন্দ্রিয়ের পাঁচটি বিষয়, ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ, সংঘাত অর্থাৎ পঞ্চ মহাভূতের পরিণামরূপ দেহ, চেতনা ও ধৃতি—এই সমস্ত বিকারযুক্ত ক্ষেত্র সংক্ষেপে বর্ণিত হল।

তাৎপর্য

মহর্ষিদের প্রামাণ্য বাক্য, বৈদিক ছন্দ ও *বেদান্তসূত্র* থেকে এই জগতের মৌলিক উপাদানগুলি জানতে পারা যায়। প্রথমে মৃত্তিকা, জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশ। এদের বলা হয় পঞ্চ-মহাভূত। তা ছাড়া আছে অহঙ্কার, বুদ্ধি ও প্রধান (অব্যক্ত অবস্থায় প্রকৃতির তিনটি গুণ)। তারপর আছে পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক। তারপর পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয়—বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ। তারপর ইন্দ্রিয়ের ঊর্ধ্বে আছে মন, যাকে অন্তরিন্দ্রিয় বলা যেতে পারে। সুতরাং, মনকে নিয়ে ইন্দ্রিয়ের সংখ্যা হচ্ছে একাদশ। তারপর আছে পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের বিষয় বা তন্মাত্র—রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শ। এই চব্বিশটি তত্ত্বকে সমষ্টিগতভাবে বলা হয় কর্মক্ষেত্র। কেউ যদি এই চব্বিশটি বিষয়ের বিশদ বিশ্লেষণ করেন, তা হলে তিনি কর্মক্ষেত্র সম্বন্ধে খুব ভালভাবে বুঝতে পারবেন। তারপর আছে ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ ও দুঃখ, যা হচ্ছে স্থূল দেহের অন্তর্গত পঞ্চ-মহাভূতের পারস্পরিক ক্রিয়া বা অভিব্যক্তি। জীবনের লক্ষণ চেতনা ও ধৃতি হচ্ছে মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার দ্বারা গঠিত সূক্ষ্মদেহের প্রকাশ। এই সূক্ষ্ম উপাদানগুলিও কর্মক্ষেত্রের অন্তর্গত।

পঞ্চ-মহাভূতগুলি হচ্ছে অহঙ্কারের স্থূল অভিব্যক্তি। সেগুলিই আবার অহঙ্কারের প্রাথমিক পর্যায়ে 'তামস-বুদ্ধি' অর্থাৎ বুদ্ধিরূপী অজ্ঞানতার জড়-জাগতিক অভিব্যক্তিরূপে পরিগণিত হয়। এটি আবার জড়া প্রকৃতির ত্রৈগুণ্যের অব্যক্ত স্তররূপে অভিব্যক্ত হয়। জড়া প্রকৃতির অব্যক্ত তিনটি গুণকে বলা হয় 'প্রধান'।

যদি কেউ এই চব্বিশটি তত্ত্ব সম্বন্ধে এবং তাদের পারস্পরিক ক্রিয়া সম্বন্ধে আরও বিশদভাবে জানতে চান, তা হলে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে *সাংখ্য-দর্শন* অধ্যয়ন করা কর্তব্য। *ভগবদ্গীতাতে* কেবল তার সারাংশ উল্লেখ করা হয়েছে।

দেহ হচ্ছে এই সব কয়টি উপাদানের অভিব্যক্তি এবং দেহের পরিবর্তন হয়। দেহের এই পরিবর্তন ছয় রকমের—দেহের জন্ম হয়, বৃদ্ধি হয়, স্থিতি হয়, বংশ বৃদ্ধি হয়, তারপর তার ক্ষয় হয় এবং অবশেষে তা বিনাশ প্রাপ্ত হয়। তাই ক্ষেত্র হচ্ছে অস্থায়ী জড় বস্তু, তবে ক্ষেত্রের মালিক *ক্ষেত্রজ্ঞ* হচ্ছেন ভিন্ন।

শ্লোক ৮-১২

অমানিত্বমদম্ভিত্বমহিংসা ক্ষান্তিরার্জবম্ ।
আচার্যোপাসনং শৌচং স্থৈর্যমাত্মবিনিগ্রহঃ ॥ ৮ ॥

ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্যমনহঙ্কার এব চ ।
জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিদুঃখদোষানুদর্শনম্ ॥ ৯ ॥
অসক্তিরনভিষ্বঙ্গঃ পুত্রদারগৃহাদিষু ।
নিত্যং চ সমচিত্তত্বমিষ্টানিষ্টোপপত্তিষু ॥ ১০ ॥
ময়ি চানন্যযোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী ।
বিবিক্তদেশসেবিত্বমরতির্জনসংসদি ॥ ১১ ॥
অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বং তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্ ।
এতজ্জ্ঞানমিতি প্রোক্তমজ্ঞানং যদতোঽন্যথা ॥ ১২ ॥

অমানিত্বম্—মানশূন্যতা; **অদম্ভিত্বম্**—দম্ভহীনতা; **অহিংসা**—অহিংসা; **ক্ষান্তিঃ**—সহিষ্ণুতা; **আর্জবম্**—সরলতা; **আচার্যোপাসনম্**—সদ্গুরুর সেবা; **শৌচম্**—শৌচ; **স্থৈর্যম্**—স্থৈর্য; **আত্মবিনিগ্রহঃ**—আত্মসংযম; **ইন্দ্রিয়ার্থেষু**—ইন্দ্রিয়-বিষয়ে; **বৈরাগ্যম্**—বিরক্তি; **অনহঙ্কারঃ**—অহঙ্কারশূন্য; **এব**—অবশ্যই; **চ**—ও; **জন্ম**—জন্ম; **মৃত্যু**—মৃত্যু; **জরা**—বার্ধক্য; **ব্যাধি**—ব্যাধি; **দুঃখ**—দুঃখের; **দোষ**—দোষ; **অনুদর্শনম্**—দর্শন; **অসক্তিঃ**—আসক্তি-রহিত; **অনভিষ্বঙ্গঃ**—অভিনিবেশ রহিত; **পুত্র**—পুত্র; **দার**—পত্নী; **গৃহাদিষু**—গৃহ আদিতে; **নিত্যম্**—সর্বদা; **চ**—ও; **সমচিত্তত্বম্**—সম-ভাবাপন্ন; **ইষ্ট**—বাঞ্ছিত; **অনিষ্ট**—অবাঞ্ছিত; **উপপত্তিষু**—লাভ করে; **ময়ি**—আমাতে; **চ**—ও; **অনন্যযোগেন**—অনন্য নিষ্ঠা সহকারে; **ভক্তিঃ**—ভক্তি; **অব্যভিচারিণী**—অপ্রতিহতা; **বিবিক্ত**—নির্জন; **দেশ**—স্থান; **সেবিত্বম্**—প্রিয়তা; **অরতিঃ**—অরুচি; **জনসংসদি**—জনাকীর্ণ স্থানে; **অধ্যাত্ম**—অধ্যাত্ম; **জ্ঞান**—জ্ঞানে; **নিত্যত্বম্**—নিত্যতা; **তত্ত্বজ্ঞান**—তত্ত্বজ্ঞানের; **অর্থ**—প্রয়োজন; **দর্শনম্**—অনুসন্ধান; **এতৎ**—এই সমস্ত; **জ্ঞানম্**—জ্ঞান; **ইতি**—এভাবে; **প্রোক্তম্**—কথিত হয়; **অজ্ঞানম্**—অজ্ঞান; **যৎ**—যা; **অতঃ**—এর থেকে; **অন্যথা**—বিপরীত।

গীতার গান

অমানিত্ব, অদাম্ভিত্ব, অহিংসা যে ক্ষান্তি ।
সরলতা, গুরুসেবা, শৌচ, ধৈর্য, শান্তি ॥
আত্মার নিগ্রহ যাহা ইন্দ্রিয় বিষয়ে ।
বৈরাগ্য নিরহঙ্কার সকল আশয়ে ॥
জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি দুঃখের দর্শন ।
অনাসক্তি স্ত্রী পুত্রেতে গৃহের প্রাঙ্গণ ॥

উদাসীন পরিবারে সুখেতে দুঃখেতে ।
নিত্য সমচিত্ত ইষ্ট অনিষ্ট মধ্যেতে ॥
আমাতে অনন্যভক্তি অব্যভিচারিণী ।
নির্জন স্থানেতে বাস গ্রাম্য নিবারণী ॥
অধ্যাত্ম জ্ঞানের করে নিত্যত্ব স্বীকার ।
তত্ত্বজ্ঞান লাগি করে দর্শন বিচার ॥
সেই সে জ্ঞানের চর্চা বিকারে নাশ ।
অজ্ঞানতমের নাম অন্যথা প্রকাশ ॥

অনুবাদ

অমানিত্ব, দম্ভশূন্যতা, অহিংসা, সহিষ্ণুতা, সরলতা, সদ্‌গুরুর সেবা, শৌচ, স্থৈর্য, আত্মসংযম, ইন্দ্রিয়-বিষয়ে বৈরাগ্য, অহঙ্কারশূন্যতা, জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধি-দুঃখ আদির দোষ দর্শন, স্ত্রী-পুত্রাদিতে আসক্তিশূন্যতা, স্ত্রী-পুত্রাদির সুখ-দুঃখে ঔদাসীন্য, সর্বদা সমচিত্তত্ব, আমার প্রতি অনন্যা ও অব্যভিচারিণী ভক্তি, নির্জন স্থান প্রিয়তা, জনাকীর্ণ স্থানে অরুচি, অধ্যাত্ম জ্ঞানে নিত্যত্ববুদ্ধি এবং তত্ত্বজ্ঞানের প্রয়োজন অনুসন্ধান—এই সমস্ত জ্ঞান বলে কথিত হয় এবং এর বিপরীত যা কিছু তা সবই অজ্ঞান।

তাৎপর্য

যথার্থ জ্ঞান লাভের এই প্রক্রিয়াকে অনেক সময় অল্প-বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষেরা ভ্রান্তিবশত ক্ষেত্রের মিথস্ক্রিয়া বলে মনে করে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটিই হচ্ছে যথার্থ জ্ঞান আহরণের পন্থা। এই পন্থা অবলম্বন করার মাধ্যমেই কেবল পরম তত্ত্বজ্ঞান লাভ করা সম্ভব হতে পারে। এটি চব্বিশটি মৌলিক তত্ত্বের পারস্পরিক ক্রিয়া নয়, যা পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এটি হচ্ছে ঐ উপাদানগুলির বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার প্রক্রিয়া। চব্বিশটি তত্ত্বের দ্বারা গঠিত একটি পিঞ্জরের মতো দেহের মধ্যে দেহধারী আত্মা আবদ্ধ হয়ে আছে এবং এখানে বর্ণিত জ্ঞান অর্জনের পন্থাই হচ্ছে এর থেকে মুক্ত হবার একমাত্র উপায়। জ্ঞান লাভের যে সমস্ত পন্থা এখানে বর্ণনা করা হয়েছে, তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশটি একাদশ শ্লোকের প্রথম ছত্রে বর্ণনা করা হয়েছে। *ময়ি চানন্যযোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী*—এই জ্ঞান পরিণামে ভগবানের প্রতি অনন্য ভক্তিতে পর্যবসিত হয়। সুতরাং কেউ যদি ভগবানের প্রতি ভক্তি লাভ না করে, অথবা লাভ করার

প্রয়াসী না হয়, তা হলে অন্য উনিশটি গুণের কোন মূল্য থাকে না। কিন্তু কেউ যদি সম্পূর্ণভাবে কৃষ্ণভাবনাময় হয়ে ভক্তিযোগের পন্থা অবলম্বন করেন, তা হলে এই উনিশটি গুণ তাঁর মধ্যে আপনা থেকেই বিকশিত হয়। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (৫/১৮/১২) বলা হয়েছে, *যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা সর্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ*। যিনি ভগবৎ-সেবার পর্যায়ে উপনীত হয়েছেন, তাঁর মধ্যে জ্ঞানের সকল প্রকার সদ্‌গুণই বিকশিত হয়ে ওঠে। তত্ত্বজ্ঞানী গুরুদেবের আনুগত্য স্বীকার করে তাঁর সেবা করার যে নির্দেশ অষ্টম শ্লোকে দেওয়া হয়েছে, তা অতি গুরুত্বপূর্ণ। এমন কি যাঁরা ভক্তিযোগে ভগবানের সেবা করছেন, তাঁদের পক্ষেও এটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। সদ্‌গুরুর আনুগত্য স্বীকার করার মাধ্যমে পারমার্থিক জীবনের শুরু হয়। পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্পষ্টভাবে এখানে বলছেন যে, জ্ঞানের এই পন্থা হচ্ছে যথার্থ পন্থা। এ ছাড়া যদি অন্য আর কোন পন্থা অনুমান করা হয়, তা হলে তা নিছক বাজে কথা ছাড়া আর কিছুই নয়।

যে জ্ঞানের উল্লেখ এখানে করা হয়েছে, তার বিষয়গুলি নিম্নলিখিতভাবে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। *অমানিত্বের* অর্থ হচ্ছে যে, অপরের কাছ থেকে সম্মান লাভের আকাঙ্ক্ষা করে আত্মতৃপ্তির জন্য উদ্বিগ্ন না হওয়া। বৈষয়িক জীবনে আমরা অপরের কাছ থেকে মান-সম্মান পাওয়ার জন্য খুব আগ্রহী হই, কিন্তু যিনি পূর্ণজ্ঞান লাভ করেছেন, যিনি উপলব্ধি করতে পেরেছেন যে, তাঁর জড় শরীরটি তাঁর স্বরূপ নয়, তাঁর কাছে জড় দেহগত সম্মান ও অসম্মান উভয়ই নিরর্থক। জড়-জাগতিক এই মোহের প্রতি লালায়িত হওয়া উচিত নয়। মানুষ তার ধর্মের মাধ্যমে খ্যাতি অর্জন করতে অত্যন্ত আগ্রহী এবং পরিণামে অনেক সময় দেখা যায় যে, ধর্মের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অবগত না হয়ে সে কোন দলভুক্ত হয়ে পড়ে এবং যথাযথভাবে ধর্মের নীতিগুলিকে অনুসরণ না করে, সে নিজেকে ধর্মের কর্ণধার বলে প্রচার করতে থাকে। পারমার্থিক তত্ত্বজ্ঞান লাভে কে কতটা উন্নতি সাধন করছে তা এই সমস্ত বিষয়গুলির মাধ্যমে বিচার করা উচিত।

অহিংসা কথাটির সাধারণ অর্থ হচ্ছে হত্যা না করা বা দেহ নষ্ট না করা। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অহিংসার অর্থ হচ্ছে অপরকে ক্লেশ না দেওয়া। অজ্ঞানতার প্রভাবে সাধারণ মানুষ জড়-জাগতিক জীবনে আবদ্ধ হয়ে পড়েছে এবং তাই তারা নিরন্তর সংসার-দুঃখ ভোগ করছে। সুতরাং মানুষকে যদি পারমার্থিক জ্ঞানের স্তরে উন্নীত না করা হয়, তা হলে হিংসার আচরণ করা হয়। সকলেরই কর্তব্য হচ্ছে মানুষকে যথাসাধ্য তত্ত্বজ্ঞান দান করা, যার ফলে তারা দিব্যজ্ঞান লাভ করে এই জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে। সেটিই হচ্ছে অহিংসা।

ক্ষান্তি বা সহনশীলতার অর্থ হচ্ছে অপরের কাছ থেকে অসম্মান অথবা অপমান সহ্য করার ক্ষমতা। কেউ যখন পারমার্থিক উন্নতি সাধনে ব্রতী হন, তখন অনেকেই তাঁকে নানাভাবে অপমান বা অসম্মান করে থাকে। সেটিই স্বাভাবিক, কারণ জড় জগতের ধরনটাই এমন। এমন কি প্রহ্লাদের মতো একটি শিশু, যিনি পাঁচ বছর বয়সে পরমার্থ সাধনে ব্রতী হয়েছিলেন, তখন তাঁর বাবাই এই ভক্তির পথে সবচেয়ে বড় শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছিল এবং নানাভাবে তাঁর অনিষ্ট করবার চেষ্টা করেছিল, এমন কি নানাভাবে তাঁকে হত্যা করারও চেষ্টা করেছিল, কিন্তু প্রহ্লাদ তার সমস্ত অত্যাচার সহ্য করেছিলেন। সুতরাং, পারমার্থিক জীবনে অগ্রসর হতে হলে নানা রকম প্রতিবন্ধক আসতে পারে, কিন্তু সেগুলি সহ্য করতে হবে এবং দৃঢ় সংকল্প নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে।

সরলতার অর্থ হচ্ছে কূটনীতি না করে নিষ্কপট হওয়া, যাতে শত্রুর কাছেও যথার্থ সত্য খুলে বলা যায়। সেই জন্য গুরু গ্রহণ করা একান্ত প্রয়োজন, কারণ সদ্‌গুরুর কাছ থেকে শিক্ষা লাভ না করলে পারমার্থিক জীবনে অগ্রসর হওয়া যায় না। নম্রতা ও বিনয়ের সঙ্গে সদ্‌গুরুর সমীপবর্তী হতে হয় এবং সর্বতোভাবে তাঁর সেবা করতে হয়, যাতে তাঁর প্রসন্নতা সাধনের মাধ্যমে তাঁর আশীর্বাদ লাভ করা যায়। সদ্‌গুরু হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণের প্রতিনিধি। তিনি যদি তাঁর শিষ্যকে কৃপা করেন, তা হলে তাঁর শিষ্য সমস্ত শাস্ত্রবিধির অনুশীলন না করেই তৎক্ষণাৎ প্রভূত উন্নতি লাভ করতে পারেন। অথবা, যিনি নিষ্কপটে শ্রীগুরুদেবের সেবা করেছেন, পারমার্থিক বিধি-নিষেধগুলি তাঁর কাছে অত্যন্ত সরল হয়ে যাবে।

পারমার্থিক জীবনে উন্নতি লাভের জন্য *শৌচ* অত্যন্ত প্রয়োজন। শৌচ দুই রকমের—বাইরের ও অন্তরের। বাহিরের শুচিতা হচ্ছে স্নান করা। কিন্তু অন্তরের শুচিতার জন্য সর্বক্ষণ শ্রীকৃষ্ণের চিন্তা করতে হবে এবং **হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে / হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে**— এই মহামন্ত্র কীর্তন করতে হবে। এই প্রক্রিয়া পূর্বকৃত কর্মের ফলে সঞ্চিত চিত্তের সমস্ত আবর্জনা পরিষ্কার করে দেয়।

স্থৈর্য অর্থ হচ্ছে পারমার্থিক জীবনে উন্নতি সাধনে দৃঢ় সংকল্প হওয়া। এই ধরনের দৃঢ় সংকল্প ছাড়া যথার্থ উন্নতি সাধন করা সম্ভব নয়। *আত্মবিনিগ্রহ* মানে হচ্ছে পারমার্থিক উন্নতির পথে যা ক্ষতিকর তা গ্রহণ না করা। পারমার্থিক উন্নতি সাধনের পথে যা বিরোধী তা বর্জন করে, এগুলি গ্রহণ করার অভ্যাস করা উচিত। সেটিই হচ্ছে যথার্থ বৈরাগ্য। ইন্দ্রিয়গুলি এত প্রবল যে, তারা সর্বদাই ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের আকাঙ্ক্ষা করে। ইন্দ্রিয়ের এই সমস্ত নিরর্থক দাবিগুলি বরদাস্ত

করা উচিত নয়, কারণ সেগুলি অনাবশ্যক। ইন্দ্রিয়গুলিকে কেবল ততটুকুই সুখ দেওয়া উচিত যার ফলে শরীর সুস্থ ও সবল থাকে এবং পারমার্থিক জীবনে উন্নতি সাধন করার জন্য কর্তব্যগুলি সম্পাদন করা যায়। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও দুর্দমনীয় ইন্দ্রিয় হচ্ছে জিহ্বা। কেউ যদি জিহ্বাকে জয় করতে পারে, তা হলে অন্য ইন্দ্রিয়গুলি জয় করার পূর্ণ সম্ভাবনা থাকে। জিহ্বার কাজই হচ্ছে স্বাদ গ্রহণ করা এবং স্পন্দন করা। তাই, তাকে দমন করবার বিধি হচ্ছে সর্বদাই কৃষ্ণপ্রসাদ গ্রহণ করা এবং হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করা। দর্শনেন্দ্রিয় চক্ষুকে জয় করার পন্থা হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের অপূর্ব সুন্দর রূপ ছাড়া তাকে আর কিছু দেখতে না দেওয়া। তার ফলে দর্শনেন্দ্রিয় চক্ষু সংযত হয়। তেমনই, কান দুটিকে সর্বদা কৃষ্ণকথা শ্রবণে এবং নাককে শ্রীকৃষ্ণের চরণে অর্পিত ফুলের ঘ্রাণ গ্রহণে নিযুক্ত রাখতে হবে। এটিই হচ্ছে ভক্তিযোগের পন্থা এবং এখানে বুঝতে পারা যায় যে, *ভগবদ্গীতা* কেবল ভক্তিযোগের বিজ্ঞানকথা ঘোষণা করছে। ভক্তি হচ্ছে মুখ্য উদ্দেশ্য। *ভগবদ্গীতার* কিছু নির্বোধ ভাষ্যকারেরা *ভগবদ্গীতার* ভ্রান্ত ভাষ্য রচনা করে পাঠককে বিভ্রান্ত করতে চেষ্টা করে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে *ভগবদ্গীতায়* ভগবদ্ভক্তি ছাড়া আর কোন বিষয়েরই উল্লেখ করা হয়নি।

অহঙ্কারের অর্থ হচ্ছে জড় শরীরটিকে নিজের স্বরূপ বলে মনে করা। কেউ যখন বুঝতে পারেন যে, তাঁর স্বরূপে তিনি তাঁর জড় শরীর নন, তাঁর স্বরূপ হচ্ছে তাঁর আত্মা, সেটিই হচ্ছে যথার্থ অহঙ্কার। অহঙ্কার থাকেই। মিথ্যা অহঙ্কার বর্জনীয়, কিন্তু যথার্থ অহঙ্কার বর্জনীয় নয়। বৈদিক শাস্ত্রে (*বৃহদারণ্যক উপনিষদ* (১/৪/১০) বলা হয়েছে, *অহং ব্রহ্মাস্মি*—আমি ব্রহ্ম, আমি আত্মা। এই 'আমি' হচ্ছে আত্মানুভূতি। এই আত্মানুভূতি আত্ম-উপলব্ধির মুক্ত অবস্থাতেও বর্তমান থাকে। 'আমি' সম্বন্ধে এই অনুভূতিকে বলা হয় অহঙ্কার, কিন্তু এই আত্মানুভূতি যখন বাস্তব বস্তুতে বা আত্মাতে প্রয়োগ হয়, তখন সেটিই হচ্ছে যথার্থ অহঙ্কার। অনেক দার্শনিক আছেন যাঁরা বলেন, আমাদের অহঙ্কার বর্জন করা উচিত। কিন্তু আমাদের এই অহঙ্কার আমরা ত্যাগ করতে পারি না, কারণ অহঙ্কার হচ্ছে আমাদের পরিচয়। তবে অবশ্যই জড় দেহ নিয়ে যে পরিচয়, তা পরিত্যাগ করতেই হবে।

জন্ম, মৃত্যু, জরা ও ব্যাধি সমন্বিত যে দুঃখ-দুর্দশা, সেই কথা বুঝতে হবে। বিভিন্ন বৈদিক শাস্ত্রে জন্ম সম্বন্ধে বর্ণনা করা হয়েছে। *শ্রীমদ্ভাগবতে* জন্মের পূর্বে মাতৃজঠরে শিশুর অবস্থান যে কত দুঃখময়, তা অতি স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। জন্ম যে কত ক্লেশদায়ক, তা পূর্ণরূপে জানতে হবে। মাতৃজঠরে কি পরিমাণ দুঃখ-দুর্দশা আমরা ভোগ করেছি, তা ভুলে যাওয়ার ফলেই আমরা জন্ম-মৃত্যুর

আবর্ত থেকে নিস্তার পাওয়ার কোন চেষ্টা করি না। তেমনই, মৃত্যুর সময়ে নানা রকম যন্ত্রণাভোগ করতে হয় এবং প্রামাণ্য শাস্ত্রাদিতে তারও বর্ণনা আছে। সেগুলি আলোচনা করা উচিত। আর জরা ও ব্যাধি যে কত যন্ত্রণাদায়ক, সেই সম্বন্ধে প্রতিটি জীবেরই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আছে। কেউই ব্যাধিগ্রস্ত হতে চায় না এবং কেউই জরাগ্রস্ত হতে চায় না। কিন্তু তবুও এগুলির হাত থেকে নিস্তার নেই। জন্ম, মৃত্যু, জরা ও ব্যাধি সমন্বিত জড় জীবন যে দুঃখময় তা বুঝতে না পারলে পারমার্থিক উন্নতি সাধনে প্রেরণা পাওয়া যায় না।

স্ত্রী, পুত্র, গৃহের প্রতি অনাসক্ত হওয়ার অর্থ এই নয় যে, তাদের প্রতি কোন অনুভূতি থাকবে না। তাদের প্রতি স্নেহের বন্ধনে আবদ্ধ হওয়াটা স্বাভাবিক। কিন্তু তারা যদি পারমার্থিক উন্নতি সাধনের অনুকূল না হয়, তা হলে তাদের প্রতি আসক্ত হওয়া উচিত নয়। গৃহকে আনন্দময় করে তোলবার শ্রেষ্ঠ প্রক্রিয়া হচ্ছে কৃষ্ণভাবনার অনুশীলন। কেউ যদি পূর্ণরূপে কৃষ্ণভাবনাময় হন, তা হলে তিনি অনায়াসে তাঁর গৃহকে অতি মনোরম সুখের আলয়ে পরিণত করতে পারেন। কারণ, কৃষ্ণভক্তির এই পন্থা অতি সরল। কেবলমাত্র প্রয়োজন **হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে / হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে**—এই মহামন্ত্র কীর্তন করা, কৃষ্ণপ্রসাদ গ্রহণ করা, *ভগবদ্গীতা* ও *শ্রীমদ্ভাগবত* আদি শাস্ত্র আলোচনা করা এবং ভগবানের শ্রীবিগ্রহ অর্চনা করা। এই চারটি বিধি অনুশীলন করলে অনায়াসে সুখী হওয়া যায়। পরিবারের প্রতিটি লোককে এই শিক্ষা দেওয়া উচিত। পরিবারের সকলের কর্তব্য সকালে ও সন্ধ্যায় একত্রে বসে **হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে / হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে**—এই মহামন্ত্র কীর্তন করা। এই চারটি নিয়ম পালন করার মাধ্যমে কেউ যদি তাঁর পরিবারকে কৃষ্ণভাবনাময় করে গড়ে তুলতে পারেন, তা হলে তাঁকে গৃহ ত্যাগ করে সন্ন্যাস নিতে হয় না। কিন্তু তা যদি তাঁর পারমার্থিক উন্নতির অনুকূল না হয়, উপযোগী না হয়, তা হলে সেই গৃহ ত্যাগ করা উচিত। কৃষ্ণ-তত্ত্বজ্ঞান লাভের [illegible] অথবা কৃষ্ণসেবার জন্য সব কিছু উৎসর্গ করা উচিত, ঠিক যেমন অর্জুন করেছিলেন। অর্জুন তাঁর আত্মীয় পরিজনদের হত্যা করতে নারাজ ছিলেন, কিন্তু তিনি যখন বুঝতে পারলেন যে, তাঁর সেই আত্মীয় পরিজনেরা তাঁর কৃষ্ণভক্তির প্রতিবন্ধক, তখন তিনি শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশ শিরোধার্য করে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন এবং তাদের হত্যা করলেন। সর্ব অবস্থাতেই মানুষকে সাংসারিক জীবনের সুখ ও দুঃখ থেকে অনাসক্ত থাকা উচিত। কারণ, এই জগতে কেউই সম্পূর্ণভাবে সুখী হতে পারে না, তেমনই আবার কেউ সম্পূর্ণভাবে দুঃখীও হতে পারে না।

সুখ ও দুঃখ হচ্ছে জড় জীবনের অপরিহার্য অঙ্গ। *ভগবদ্গীতার* উপদেশ অনুসারে এগুলিকে সহ্য করতে চেষ্টা করা উচিত। সুখ ও দুঃখ আসে যায় এবং তাদের আমরা নিয়ন্ত্রণ করতে পারি না। সুতরাং, সকলেরই কর্তব্য হচ্ছে জড়-জাগতিক জীবনের প্রতি অনাসক্ত হওয়া, তা হলে এই সুখ ও দুঃখ উভয়েরই প্রতি সম-ভাবাপন্ন হওয়া সম্ভব। সাধারণত, যখন আমরা আমাদের কাম্য বস্তু অর্জন করি, তখন আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হই এবং যখন আমরা অবাঞ্ছিত কোন কিছু প্রাপ্ত হই, তখন আমরা দুঃখিত হই। কিন্তু আমরা যদি যথাযথভাবে পারমার্থিক স্তরে অধিষ্ঠিত থাকি, তা হলে এই বিষয়গুলি আমাদের বিচলিত করতে পারবে না। এই স্তরে অধিষ্ঠিত হতে হলে আমাদেরকে ভক্তিযোগে নিরন্তর ভগবানের সেবা করতে হবে। অবিচলিতভাবে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করার অর্থ হচ্ছে শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, বন্দন, অর্চন, পাদসেবন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন—এই নববিধা ভক্তির অনুশীলন করা, যা নবম অধ্যায়ের শেষ শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে। সেই পদ্ধতি মেনে চলা উচিত।

কেউ যখন পারমার্থিক জীবন লাভ করেন, তখন তিনি স্বাভাবিকভাবেই বৈষয়িক লোকেদের সঙ্গে আর মেলামেশা করতে চাইবেন না। অসাধুসঙ্গ তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ। অসাধুসঙ্গ বর্জন করে নির্জন বাসের প্রতি কতটা অনুরাগ এসেছে, তার মাধ্যমে নিজেকে পরীক্ষা করা যেতে পারে। খেলাধুলা, সিনেমা, সামাজিক অনুষ্ঠান আদিতে ভক্তের স্বাভাবিকভাবেই কোন রুচি থাকে না। কারণ তিনি বুঝতে পারেন যে, এগুলি কেবল সময়েরই অপচয় মাত্র। অনেক গবেষক ও দার্শনিক আছেন, যাঁরা যৌন বিজ্ঞান অথবা সেই ধরনের বিষয় নিয়ে গবেষণা করেন। কিন্তু *ভগবদ্গীতার* উপদেশ অনুসারে সেই সমস্ত গবেষণা ও দার্শনিক অনুমানগুলির কোন মূল্য নেই। সেগুলি এক রকম নিরর্থক প্রয়াস মাত্র। *ভগবদ্গীতার* নির্দেশ অনুসারে, তত্ত্বজ্ঞানের মাধ্যমে আত্মার স্বরূপ সম্বন্ধে গবেষণা করা উচিত। নিজেকে জানার জন্য গবেষণা করা উচিত। সেই নির্দেশই এখানে দেওয়া হয়েছে।

আত্ম-উপলব্ধি সম্বন্ধে এখানে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, ভক্তিযোগের পন্থা বিশেষভাবে বাস্তব-সম্মত। ভক্তিযোগ বলতে পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মার সম্পর্ক বুঝতে হবে। জীবাত্মা ও পরমাত্মা কখনই এক হতে পারে না—অন্তত ভক্তিমার্গে। পরমাত্মার প্রতি জীবাত্মার এই সেবা নিত্য। সেই কথা স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। সুতরাং ভক্তিযোগ নিত্য। এই তত্ত্বজ্ঞানে দৃঢ় প্রত্যয়সম্পন্ন হওয়া উচিত।

শ্রীমদ্ভাগবতে (১/২/১১) এই সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। *বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ম্*। "যাঁরা যথার্থ তত্ত্বজ্ঞানী তাঁরা জানেন যে, অদ্বয় পরমতত্ত্ব ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান—এই তিনরূপে উপলব্ধ হন।" পরম-তত্ত্বের

চরম উপলব্ধি হচ্ছেন ভগবান। সুতরাং, সেই চরম স্তরে উন্নীত হয়ে পরম পুরুষোত্তম ভগবানকে উপলব্ধি করা উচিত এবং ভক্তিযোগে তাঁর সেবায় নিযুক্ত হওয়া উচিত। সেটিই হচ্ছে জ্ঞানের পূর্ণতা।

অমানিত্ব থেকে শুরু করে পরমতত্ত্ব পরম পুরুষ ভগবানকে উপলব্ধি করার স্তর পর্যন্ত এই পন্থাটি একটি সিঁড়ির মতো, যেন একতলা থেকে শুরু হয়ে ছাদ পর্যন্ত উঠে গেছে। এখন এই সিঁড়িতে বহু লোক আছেন, যাঁরা একতলা, দুতলা অথবা তিনতলা আদিতে পৌঁছে গেছেন, কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত না সর্বোচ্চ তলায় পৌঁছানো যাচ্ছে, যা হচ্ছে কৃষ্ণ-উপলব্ধি, ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁরা জ্ঞানের নিম্নপর্যায়েই অবস্থিত। কেউ যদি ভগবানের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে পারমার্থিক উন্নতি লাভ করতে চায়, তা হলে তার সে আশা ব্যর্থ হবে। এখানে স্পষ্টভাবেই বলা হয়েছে যে, অমানিত্ব ব্যতিরেকে উপলব্ধি সত্যিই সম্ভব নয়। নিজেকে ভগবান বলে মনে করা মিথ্যা অহঙ্কারের চরম প্রকাশ। প্রকৃতির কঠোর শাসনে জীব যদিও প্রতিনিয়তই পদদলিত হচ্ছে, তবুও অজ্ঞানতার প্রভাবে সে মনে করছে, "আমি ভগবান।" সেই জন্যই জ্ঞানের সূচনা হচ্ছে *অমানিত্ব*। সকলেরই উচিত নম্র হওয়া এবং সর্ব অবস্থাতেই নিজেকে ভগবানের নিয়ন্ত্রণাধীন বলে মনে করা। পরমেশ্বর ভগবানের আধিপত্য স্বীকার না করে বিদ্রোহী হওয়ার ফলেই আমরা জড়া প্রকৃতির অধীনস্থ হয়ে পড়েছি। এই তত্ত্বকে উপলব্ধি করে, তার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস থাকা উচিত।

শ্লোক ১৩

জ্ঞেয়ং যত্তৎপ্রবক্ষ্যামি যজ্জ্ঞাত্বামৃতমশ্নুতে ।
অনাদি মৎপরং ব্রহ্ম ন সত্তন্নাসদুচ্যতে ॥ ১৩ ॥

জ্ঞেয়ম্—জ্ঞাতব্য বিষয়; **যৎ**—যা; **তৎ**—তা; **প্রবক্ষ্যামি**—আমি এখন বলব; **যৎ**—যা; **জ্ঞাত্বা**—জেনে; **অমৃতম্**—অমৃত; **অশ্নুতে**—লাভ হয়; **অনাদি**—আদিহীন; **মৎপরম্**—আমার আশ্রিত; **ব্রহ্ম**—ব্রহ্ম; **ন**—নয়; **সৎ**—কারণ; **তৎ**—তা; **ন**—নয়; **অসৎ**—কার্য; **উচ্যতে**—বলা হয়।

গীতার গান

জ্ঞানের জ্ঞাতব্য যাহা তাহা বলি শুন ।
জানিতে সে তত্ত্ব হবে অমৃতের পান ॥

সেই ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞান আমার আশ্রিত ।
অনাদি সে সৎ আর অসৎ অতীত ॥

অনুবাদ

আমি এখন জ্ঞাতব্য বিষয় সম্বন্ধে বলব, যা জেনে অমৃতত্ব লাভ হয়। সেই জ্ঞেয় বস্তু অনাদি এবং আমার আশ্রিত। তাকে বলা হয় ব্রহ্ম এবং তা কার্য ও কারণের অতীত।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবান ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি ক্ষেত্রজ্ঞকে জানবার পন্থাও ব্যাখ্যা করেছেন। এখন এখানে তিনি জ্ঞাতব্য বিষয় আত্মা ও পরমাত্মা উভয়ের সম্বন্ধে ব্যাখ্যা দিতে শুরু করেছেন। আত্মা ও পরমাত্মা এই উভয় ক্ষেত্রজ্ঞ সম্বন্ধে জানবার মাধ্যমেই জীবনে অমৃতের আস্বাদন করা যায়। দ্বিতীয় অধ্যায়ে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, জীব নিত্য। এখানেও সেই তত্ত্ব প্রতিপন্ন করা হয়েছে। জীবের জন্ম-তারিখ খুঁজে পাওয়া যায় না। পরমেশ্বর ভগবানের থেকে কিভাবে জীবাত্মার প্রকাশ হল, তারও কোন ইতিহাস নেই। তাই তা অনাদি। বৈদিক শাস্ত্রে তার সত্যতা প্রতিপন্ন করে বলা হয়েছে—*ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ* (*কঠ উপনিষদ* ১/২/১৮)। দেহের জ্ঞাতার কখনও জন্ম হয় না, কখনও মৃত্যুও হয় না এবং সে পূর্ণ জ্ঞানময়।

পরমাত্মা রূপে পরমেশ্বর ভগবান সম্বন্ধেও বৈদিক শাস্ত্রে (*শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ* ৬/১৬) বলা হয়েছে, *প্রধানক্ষেত্রজ্ঞপতির্গুণেশঃ*—প্রধান ক্ষেত্রজ্ঞ এবং জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণের নিয়ন্তা। *স্মৃতি* শাস্ত্রে বলা হয়েছে—*দাসভূতো হরেরেব নান্যস্যৈব কদাচন*। জীব নিত্যকাল ধরে পরমেশ্বর ভগবানের সেবা করে চলেছে। সেই কথা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুও তাঁর উপদেশাবলীতে প্রতিপন্ন করেছেন। তাই এই শ্লোকে যে ব্রহ্মের উল্লেখ করা হয়েছে, তা জীবাত্মা সম্বন্ধীয়। জীবাত্মাকে যখন ব্রহ্ম বলে উল্লেখ করা হয়, তখন বুঝতে হবে যে, তা হচ্ছে *বিজ্ঞান-ব্রহ্ম*, যার বিপরীত হচ্ছে *আনন্দ-ব্রহ্ম*। *আনন্দ-ব্রহ্ম* হচ্ছেন পরমব্রহ্ম পরমেশ্বর ভগবান।

শ্লোক ১৪

সর্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্ ।
সর্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥ ১৪ ॥

সর্বতঃ—সর্বত্র; **পাণি**—হস্ত; **পাদম্**—পদ; **তৎ**—তা; **সর্বতঃ**—সর্বত্র; **অক্ষি**—চক্ষু; **শিরঃ**—মস্তক; **মুখম্**—মুখ; **সর্বতঃ**—সর্বত্র; **শ্রুতিমৎ**—কর্ণবিশিষ্ট; **লোকে**—জগতে; **সর্বম্**—সব কিছু; **আবৃত্য**—পরিব্যাপ্ত করে; **তিষ্ঠতি**—স্থিত আছেন।

গীতার গান

সর্বস্থানে হস্তপদ নহে নিরাকার ।
সর্বস্থানে চক্ষু শির কত মুখ তার ॥
সর্বত্র শ্রবণ সর্ব আবরণ স্থান ।
তিনি ছাড়া ত্রিভুবনে নাহি কিছু আন ॥

অনুবাদ

তাঁর হস্ত, পদ, চক্ষু, মস্তক ও মুখ সর্বত্রই এবং তিনি সর্বত্রই কর্ণযুক্ত। জগতে সব কিছুকেই পরিব্যাপ্ত করে তিনি বিরাজমান।

তাৎপর্য

সূর্য যেমন অনন্ত কিরণ বিকিরণ করে বিরাজমান, পরমাত্মা বা পরমেশ্বর ভগবানও তেমনই তাঁর সর্বব্যাপ্ত রূপে বিরাজমান। ব্রহ্মা থেকে শুরু করে ক্ষুদ্র পিপীলিকা পর্যন্ত সমস্ত জীবই তাঁকে আশ্রয় করে আছে। তাঁর সেই সর্বব্যাপী রূপের মধ্যে অসংখ্য মস্তক, পদ, হস্ত, চক্ষু এবং অসংখ্য জীবাত্মা রয়েছে। সবই পরমাত্মার মধ্যে ও উপরে বিরাজ করছে। তাই পরমাত্মা সর্বব্যাপ্ত। কিন্তু জীবাত্মা কখনও বলতে পারে না যে, তার হাত, পা, চোখ আদি সর্বব্যাপ্ত। তা কখনও সম্ভব নয়। যদি সে তা মনে করেও, তার অজ্ঞানতার ফলে সে এখন বুঝতে পারছে না যে, তার হস্ত পদ সর্বব্যাপ্ত। কিন্তু যখন সে যথার্থ জ্ঞান লাভ করবে, তখন অনুভব করতে পারবে যে, তার এই চিন্তাধারা পরস্পর-বিরোধী। তার অর্থ হচ্ছে যে, জড়া প্রকৃতির দ্বারা আবদ্ধ হয়ে পড়ার ফলে জীব পরম সত্তা নয়। পরমেশ্বর জীবাত্মা থেকে ভিন্ন। পরমেশ্বর ভগবান সীমা ছাড়িয়ে তাঁর হাত বর্ধিত করতে পারেন, কিন্তু জীবাত্মা তা পারে না। *ভগবদ্গীতায়* ভগবান বলছেন যে, যদি কেউ তাঁকে ফুল, ফল অথবা জল নিবেদন করেন, তা হলে তিনি তা গ্রহণ করেন। ভগবান যদি দূরে থাকেন, তা হলে কি করে তিনি তা গ্রহণ করেন? সেটিই হচ্ছে ভগবানের সর্বশক্তিমত্তা—এমন কি যদিও তিনি এই পৃথিবী থেকে অনেক দূরে তাঁর নিজ ধামে রয়েছেন, তবুও তিনি তাঁর হস্ত প্রসারিত করে তাঁর উদ্দেশ্যে

নিবেদিত নৈবেদ্য গ্রহণ করতে পারেন। এমনই হচ্ছে তাঁর অচিন্ত্য শক্তি। *ব্রহ্মসংহিতায়* (৫/৩৭) বলা হয়েছে, *গোলোক এব নিবসত্যখিলাত্মভূতঃ*—যদিও তিনি সর্বদাই তাঁর চিন্ময় ধাম গোলোক বৃন্দাবনে অপ্রাকৃত লীলা বিলাস করছেন, তবুও তিনি সর্বত্রই বিরাজমান। জীবাত্মা কখনই দাবি করতে পারে না যে, সে সর্বত্রই বিরাজমান। তাই এই শ্লোকে বর্ণনা করা হচ্ছে যে, পরমাত্মা পরমেশ্বর ভগবান জীবাত্মা নন।

শ্লোক ১৫

সর্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্বেন্দ্রিয়বিবর্জিতম্ ।
অসক্তং সর্বভৃচ্চৈব নির্গুণং গুণভোক্তৃ চ ॥ ১৫ ॥

সর্ব—সমস্ত; **ইন্দ্রিয়**—ইন্দ্রিয়ের; **গুণ**—গুণের; **আভাসম্**—প্রকাশক; **সর্ব**—সমস্ত; **ইন্দ্রিয়**—ইন্দ্রিয়; **বিবর্জিতম্**—রহিত; **অসক্তম্**—আসক্তি রহিত; **সর্বভৃৎ**—সকলের পালক; **চ**—ও; **এব**—অবশ্যই; **নির্গুণম্**—জড় গুণরহিত; **গুণভোক্তৃ**—সমস্ত গুণের ঈশ্বর; **চ**—ও।

গীতার গান

তাঁহা হতে ইন্দ্রিয়াদি হয়েছে প্রকাশ ।
জড়েন্দ্রিয় নাহি তাঁর সর্বগুণাভাস ॥
অনাসক্ত সর্বভৃৎ তিনি সে নির্গুণ ।
সকল গুণের ভোক্তা তিনি চিরন্তন ॥

অনুবাদ

সেই পরমাত্মা সমস্ত ইন্দ্রিয়ের প্রকাশক, তবুও তিনি সমস্ত ইন্দ্রিয় বিবর্জিত। যদিও তিনি সকলের পালক, তবুও তিনি সম্পূর্ণ অনাসক্ত। তিনি প্রকৃতির গুণের অতীত, তবুও তিনি সমস্ত গুণের ঈশ্বর।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবান যদিও সমস্ত জীবের সমস্ত ইন্দ্রিয়ের আধার, কিন্তু তা বলে তাদের মতো জড় ইন্দ্রিয় তাঁর নেই। প্রকৃতপক্ষে, জীবাত্মারও চিন্ময় ইন্দ্রিয় আছে, কিন্তু বদ্ধ অবস্থায় তারা জড় গুণের দ্বারা আচ্ছাদিত। তাই, জড়ের মাধ্যমে চেতন

ইন্দ্রিয়ের কার্যকলাপ প্রকাশ হতে দেখা যায়। পরমেশ্বর ভগবানের ইন্দ্রিয়গুলি এই রকম আচ্ছাদিত নয়। তাঁর ইন্দ্রিয়গুলি অপ্রাকৃত এবং তাই তাদের বলা হয় নির্গুণ। গুণ হচ্ছে প্রকৃতির বৃত্তি, কিন্তু ভগবানের ইন্দ্রিয়গুলি জড় আবরণ থেকে মুক্ত। আমাদের হৃদয়ঙ্গম করতে হবে যে, তাঁর ইন্দ্রিয়গুলি ঠিক আমাদের মতো নয়। আমাদের সমস্ত ইন্দ্রিয়জাত কর্মের উৎস যদিও তিনি, কিন্তু তাঁর ইন্দ্রিয়গুলি দিব্য ও কলুষমুক্ত। সেই কথা *শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে* (৩/১৯) *অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা*— এই শ্লোকে খুব সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে। পরমেশ্বর ভগবানের জড়-জাগতিক কলুষযুক্ত কোন হাত নেই, কিন্তু তবুও তাঁর হাত আছে এবং সেই হাত দিয়ে তিনি তাঁর উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত সমস্ত নৈবেদ্য গ্রহণ করেন। এটিই হচ্ছে বদ্ধ জীবাত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে পার্থক্য। ভগবানের জড় চক্ষু নেই, কিন্তু তাঁর চক্ষু আছে—তা না হলে তিনি দেখতে পান কি করে? তিনি অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ—সব কিছু দেখতে পান। তিনি সমস্ত জীবের হৃদয়ে বিরাজ করেন এবং অতীতে আমরা কি করেছি, এখন আমরা কি করছি এবং আমাদের ভবিষ্যতে কি হবে, তা সবই তিনি জানেন। *ভগবদ্গীতাতেও* সেই কথা প্রতিপন্ন হয়েছে—তিনি সব কিছু জানেন, কিন্তু তাঁকে কেউ জানে না। শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে, ভগবানের আমাদের মতো পা নেই, কিন্তু তিনি সর্বত্র মহাশূন্যে বিচরণ করতে পারেন, কারণ তাঁর পা অপ্রাকৃত। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, ভগবান নির্বিশেষ নন, নিরাকার নন, ব্যক্তিত্বহীন নন। তাঁর চোখ আছে, পা আছে, হাত আছে এবং সব কিছুই আছে। যেহেতু আমরা ভগবানের বিভিন্নাংশ, তাই আমরাও এই সমস্ত অঙ্গগুলি অর্জন করেছি। কিন্তু তাঁর হাত, পা, চোখ ও ইন্দ্রিয়গুলি কখনই জড়া প্রকৃতির দ্বারা কলুষিত হয় না।

ভগবদ্গীতায় আরও বলা হয়েছে যে, যখন পরমেশ্বর ভগবান এই জড় জগতে অবতরণ করেন, তখন তিনি তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তির প্রভাবে তাঁর স্বরূপে আবির্ভূত হন। তিনি কখনই জড়া প্রকৃতির দ্বারা কলুষিত হন না, কারণ তিনি হচ্ছেন জড়া প্রকৃতির অধীশ্বর। বৈদিক শাস্ত্রে আমরা জানতে পারি যে, তাঁর সমগ্র সত্তা চিন্ময়। তাঁর রূপ নিত্য—তিনি সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ। তিনি পূর্ণ ঐশ্বর্যময়। তিনি হচ্ছেন সমস্ত সম্পদের মালিক এবং সমস্ত শক্তির অধীশ্বর। তিনি সবচেয়ে বুদ্ধিমান এবং পূর্ণ জ্ঞানময়। এগুলি হচ্ছে পরম পুরুষোত্তম ভগবানের কয়েকটি লক্ষণ। তিনি সমস্ত জীবের পালনকর্তা এবং তাদের সমস্ত কর্মের সাক্ষী। বৈদিক শাস্ত্র থেকে আমরা জানতে পারি যে, পরমেশ্বর ভগবান সর্বদাই জড়াতীত। আমরা যদিও তাঁর মস্তক, মুখমণ্ডল, হস্ত অথবা পদ দেখতে পাই না, তবুও তাঁর এগুলি আছে

এবং আমরা যখন চিন্ময় স্তরে উন্নীত হই, তখন আমরা ভগবানের রূপ দর্শন করতে পারি। জড় জগতের সংস্পর্শে আসার ফলে যেহেতু আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি কলুষিত হয়ে পড়েছে, তাই আমরা তাঁর রূপ দেখতে পাই না। সেই জন্য নির্বিশেষবাদীরা, যারা এখনও জড় গুণের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে রয়েছে, তারা পরমেশ্বর ভগবানকে জানতে পারে না।

শ্লোক ১৬

বহিরন্তশ্চ ভূতানামচরং চরমেব চ ।
সূক্ষ্মত্বাত্তদবিজ্ঞেয়ং দূরস্থং চান্তিকে চ তৎ ॥ ১৬ ॥

বহিঃ—বাইরে; **অন্তঃ**—অন্তরে; **চ**—ও; **ভূতানাম্**—সমস্ত জীবের; **অচরম্**—স্থাবর; **চরম্**—জঙ্গম; **এব**—ও; **চ**—এবং; **সূক্ষ্মত্বাৎ**—সূক্ষ্মতা হেতু; **তৎ**—তা; **অবিজ্ঞেয়ম্**—অবিজ্ঞেয়; **দূরস্থম্**—দূরে অবস্থিত; **চ**—ও; **অন্তিকে**—নিকটে; **চ**—এবং; **তৎ**—তা।

গীতার গান

সকল ভূতের তিনি অন্তরে বাহিরে ।
তাঁহা হতে হয় সব চর বা অচর ॥
অতি সূক্ষ্ম তত্ত্ব তাই অবিজ্ঞেয় ।
যুগপৎ বহু দূরে নিকটেতেও হয় ॥

অনুবাদ

সেই পরমতত্ত্ব সমস্ত ভূতের অন্তরে ও বাইরে বর্তমান। তাঁর থেকেই সমস্ত চরাচর; অত্যন্ত সূক্ষ্মতা হেতু তিনি অবিজ্ঞেয়। যদিও তিনি বহু দূরে অবস্থিত, কিন্তু তবুও তিনি সকলের অত্যন্ত নিকটে।

তাৎপর্য

বৈদিক শাস্ত্র থেকে আমরা জানতে পারি যে, পরমেশ্বর ভগবান নারায়ণ প্রতিটি জীবের অন্তরে ও বাইরে বিরাজ করছেন। তিনি চিন্ময় ও জড় উভয় জগতে রয়েছেন। যদিও তিনি অনেক অনেক দূরে, তবুও তিনি আমাদের অতি নিকটেই। এগুলি হচ্ছে বৈদিক শাস্ত্রের বর্ণনা। *আসীনো দূরং ব্রজতি শয়ানো যাতি সর্বতঃ* (*কঠ উপনিষদ* ১/২/২১)। আর যেহেতু তিনি সর্বদাই চিদানন্দময়, তাই আমরা

বুঝতে পারি না কিভাবে তিনি তাঁর পূর্ণ ঐশ্বর্য উপভোগ করছেন। এই জড় ইন্দ্রিয়গুলির মাধ্যমে আমরা তা দেখতে পাই না বা বুঝতে পারি না। তাই বৈদিক শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে, আমাদের জড় মন ও ইন্দ্রিয় দিয়ে তাঁকে উপলব্ধি করা কখনই সম্ভব নয়। কিন্তু ভক্তি সহকারে কৃষ্ণভাবনামৃত অনুশীলন করার ফলে যাঁর মন ও ইন্দ্রিয় নির্মল হয়েছে, তিনি নিরন্তর তাঁকে দর্শন করতে পারেন। *ব্রহ্মসংহিতাতে* সেই সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে, যে ভক্ত প্রেমভক্তিতে ভগবানের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন, তিনি নিরন্তর তাঁকে দর্শন করতে পারেন। আর *ভগবদ্গীতাতে* (১১/৫৪) তা প্রতিপন্ন করে বলা হয়েছে, ভক্তিযোগের মাধ্যমেই কেবল তাঁকে দর্শন করা যায় এবং উপলব্ধি করা যায়। *ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্যঃ*।

শ্লোক ১৭

অবিভক্তং চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্ ।
ভূতভর্তৃ চ তজ্জ্ঞেয়ং গ্রসিষ্ণু প্রভবিষ্ণু চ ॥ ১৭ ॥

অবিভক্তম্—অবিভক্ত; **চ**—ও; **ভূতেষু**—সর্বভূতে; **বিভক্তম্**—বিভক্ত; **ইব**—মতো; **চ**—ও; **স্থিতম্**—অবস্থিত; **ভূতভর্তৃ**—সর্বভূতের পালক; **চ**—ও; **তৎ**—তা; **জ্ঞেয়ম্**—জানবে; **গ্রসিষ্ণু**—গ্রাসকারী; **প্রভবিষ্ণু**—প্রভুত্বকারী; **চ**—ও।

গীতার গান

অবিভক্ত হইয়াও বিভক্তের মত ।
অখণ্ড সমষ্টি তিনি ব্যষ্টিরূপে স্থিত ॥
সর্বভূত ভর্তা তিনি সব জন্মদাতা ।
তিনিই সবার পুনঃ সংহারের কর্তা ॥

অনুবাদ

পরমাত্মাকে যদিও সমস্ত ভূতে বিভক্তরূপে বোধ হয়, কিন্তু তিনি অবিভক্ত। যদিও তিনি সর্বভূতের পালক, তবুও তাঁকে সংহার-কর্তা ও সৃষ্টিকর্তা বলে জানবে।

তাৎপর্য

পরমাত্মা রূপে ভগবান সকলেরই হৃদয়ে বিরাজমান। তা হলে তার অর্থ কি তিনি বিভক্ত হয়েছেন? না। প্রকৃতপক্ষে তিনি এক এবং অদ্বিতীয়। এই প্রসঙ্গে

সূর্যের উদাহরণ দেওয়া হয়—মধ্যাহ্নকালীন সূর্য তার কক্ষপথে অবস্থিত থাকে। কিন্তু কেউ যদি পাঁচ হাজার মাইল পরিধি জুড়ে সকলকে জিজ্ঞেস করেন, "সূর্য কোথায়?" তা হলে সকলেই বলবে যে, তার মাথার উপর জ্বল জ্বল করছে। বৈদিক শাস্ত্রে এই উদাহরণটির মাধ্যমে বোঝানো হয়েছে যে, যদিও তিনি অবিভক্ত, তবুও মনে হয় যেন তিনি বিভক্তের মতো। বৈদিক শাস্ত্রে এই রকমও বলা হয়েছে যে, এক বিষ্ণু তাঁর অচিন্ত্য শক্তির প্রভাবে সর্বত্রই বিরাজমান, ঠিক যেমন সূর্য অনেক জায়গায় অনেকের কাছে প্রতিভাত হয়। আর পরমেশ্বর ভগবান যদিও সমস্ত জীবের পালনকর্তা, প্রলয়কালে তিনি সব কিছু গ্রাস করেন। সেই কথা একাদশ অধ্যায়ে প্রতিপন্ন করা হয়েছে, যখন ভগবান বলেছেন যে, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে সমবেত সমস্ত যোদ্ধাদের গ্রাস করবার জন্য তিনি এসেছেন। তিনি আরও বলেছেন যে, কালরূপেও তিনি গ্রাস করেন। তিনি বিনাশকর্তা—সকলকে তিনি ধ্বংস করেন। সৃষ্টির সময় তিনি সব কিছুই তাদের আদি অবস্থা থেকে বিকাশ সাধন করেন এবং বিনাশের সময় তিনি তাদের গ্রাস করেন। বৈদিক শ্লোকে সেই সত্যকে প্রতিপন্ন করে বলা হয়েছে যে, তিনি সমস্ত জীবের উৎস এবং আশ্রয়। সৃষ্টির পরে সব কিছুই তাঁর সর্ব শক্তিমত্তাকে আশ্রয় করে স্থিত হয় এবং বিনাশের পরে সব কিছুই আবার তাঁর মধ্যে আশ্রয় নিতে তাঁর কাছে ফিরে যায়। সেই সম্বন্ধে *বেদে* বলা হয়েছে—*যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্ ব্রহ্ম তদ্ বিজিজ্ঞাসস্ব*। (*তৈত্তিরীয় উপনিষদ* ৩/১)।

শ্লোক ১৮

জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতিস্তমসঃ পরমুচ্যতে ।
জ্ঞানং জ্ঞেয়ং জ্ঞানগম্যং হৃদি সর্বস্য বিষ্ঠিতম্ ॥ ১৮ ॥

জ্যোতিষাম্—সমস্ত জ্যোতিষ্কের; **অপি**—ও; **তৎ**—তা; **জ্যোতিঃ**—জ্যোতি; **তমসঃ**—অন্ধকারের; **পরম্**—অতীত; **উচ্যতে**—বলা হয়; **জ্ঞানম্**—জ্ঞান; **জ্ঞেয়ম্**—জ্ঞেয়; **জ্ঞানগম্যম্**—জ্ঞানগম্য; **হৃদি**—হৃদয়ে; **সর্বস্য**—সকলের; **বিষ্ঠিতম্**—অবস্থিত।

গীতার গান

সমস্ত জ্যোতির তিনি পরম আধার ।
চিন্ময় তাঁহার জ্যোতি জড় পর আর ॥

জ্ঞানময় রূপ তাঁর জ্ঞানগম্য জ্ঞেয় ।
সকলের হৃদিমাঝে তিনি অধিষ্ঠেয় ॥

অনুবাদ

তিনি সমস্ত জ্যোতিষ্কের পরম জ্যোতি। তাঁকে সমস্ত অন্ধকারের অতীত অব্যক্ত স্বরূপ বলা হয়। তিনিই জ্ঞান, তিনিই জ্ঞেয় এবং তিনিই জ্ঞানগম্য। তিনি সকলের হৃদয়ে অবস্থিত।

তাৎপর্য

পরমাত্মা বা পরম পুরুষ ভগবান হচ্ছেন সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্র আদি সমস্ত জ্যোতিষ্কের জ্যোতির উৎস। বৈদিক শাস্ত্র থেকে আমরা জানতে পারি যে, চিৎ-জগৎকে আলোকিত করার জন্য সূর্য অথবা চন্দ্রের প্রয়োজন হয় না, কারণ সেই জগৎ পরমেশ্বরের জ্যোতিতে উদ্ভাসিত। জড়া প্রকৃতিতে সেই ব্রহ্মজ্যোতি বা ভগবানের দেহনির্গত রশ্মিচ্ছটা জড়া প্রকৃতির মহৎ-তত্ত্বের দ্বারা আচ্ছাদিত। তাই, এই জড় জগৎকে আলোকিত করবার জন্য সূর্য, চন্দ্র ও বৈদ্যুতিক শক্তি আদির প্রয়োজন হয়। কিন্তু চিৎ-জগতে তাদের কোন প্রয়োজন হয় না। বৈদিক শাস্ত্রে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তাঁর জ্যোতিচ্ছটায় সব কিছুই উদ্ভাসিত। তাই এটি স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে, তিনি জড় জগতে অবস্থান করেন না। তিনি অবস্থান করেন চিৎ-জগতে, যা এই জগৎ থেকে অনেক অনেক দূরে চিদাকাশে অবস্থিত। বৈদিক শাস্ত্রে সেই সম্বন্ধে বলা হয়েছে, *আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ* (*শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ* ৩/৮)। তিনি সূর্যের মতো নিত্য জ্যোতির্ময়, কিন্তু তিনি এই তমসাচ্ছন্ন জড় জগৎ থেকে বহু বহু দূরে রয়েছেন।

তাঁর জ্ঞান দিব্য। বৈদিক শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে, ঘনীভূত দিব্যজ্ঞান হচ্ছে ব্রহ্ম। যিনি চিৎ-জগতে ফিরে যেতে আগ্রহী, তাঁকে সকলের হৃদয়ে বিরাজমান পরমেশ্বর ভগবান দিব্যজ্ঞান দান করেন। একটি বৈদিক মন্ত্রে (*শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ* ৬/১৮) বলা হচ্ছে—*তং হ দেবমাত্মবুদ্ধিপ্রকাশং মুমুক্ষুর্বৈ শরণমহং প্রপদ্যে*। কেউ যদি মুক্তির আকাঙ্ক্ষা করে, তা হলে তাকে অবশ্যই পরম পুরুষোত্তম ভগবানের কাছে আত্মসমর্পণ করতে হবে। পরম জ্ঞানের চরম উদ্দেশ্য সম্বন্ধেও বৈদিক শাস্ত্রে বলা হয়েছে—*তমেব বিদিত্বাতি মৃত্যুমেতি*। "কেবলমাত্র তাঁকে জানার ফলেই মানুষ জন্ম-মৃত্যুর সীমানা অতিক্রম করতে পারে।" (*শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ* ৩/৮)

পরম নিয়ন্তারূপে ভগবান সকলের হৃদয়ে অবস্থান করছেন। তাঁর হাত, পা সর্বত্রই রয়েছে, কিন্তু জীবাত্মা সম্বন্ধে সেই কথা বলা যায় না। সুতরাং ক্ষেত্রজ্ঞ

দুজন—জীবাত্মা ও পরমাত্মা এবং সেই কথা স্বীকার করতেই হবে। জীবাত্মার হাত, পা কোন নির্দিষ্ট স্থানে রয়েছে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের হাত, পা সর্বত্রই রয়েছে। সেই সম্বন্ধে *শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে* (৩/১৭) বলা হয়েছে—*সর্বস্য প্রভুমীশানং সর্বস্য শরণং বৃহৎ*। সেই পরম পুরুষোত্তম ভগবান বা পরমাত্মা হচ্ছেন সর্ব জীবের প্রভু, তাই তিনি হচ্ছেন সমস্ত জীবের পরম আশ্রয়। সুতরাং পরমাত্মা ও জীবাত্মা যে সর্ব অবস্থাতেই ভিন্ন, সেই কথা কোন মতেই অস্বীকার করা যায় না।

শ্লোক ১৯

ইতি ক্ষেত্রং তথা জ্ঞানং জ্ঞেয়ং চোক্তং সমাসতঃ ।
মদ্ভক্ত এতদ্বিজ্ঞায় মদ্ভাবায়োপপদ্যতে ॥ ১৯ ॥

ইতি—এভাবেই; **ক্ষেত্রম্**—ক্ষেত্র (দেহ); **তথা**—ও; **জ্ঞানম্**—জ্ঞান; **জ্ঞেয়ম্**—জ্ঞেয়; **চ**—ও; **উক্তম্**—বলা হল; **সমাসতঃ**—সংক্ষেপে; **মদ্ভক্তঃ**—আমার ভক্ত; **এতৎ**—এই সমস্ত; **বিজ্ঞায়**—বিদিত হয়ে; **মদ্ভাবায়**—আমার ভাব; **উপপদ্যতে**—লাভ করেন।

গীতার গান

এই কহিনু তত্ত্ব ক্ষেত্র জ্ঞান জ্ঞেয় ।
বিজ্ঞান তাহার নাম পণ্ডিতের প্রিয় ॥
এ বিজ্ঞান বুঝিয়া সে মোর ভক্ত হয় ।
তত্ত্ব শুদ্ধি জ্ঞান হয় ভক্তির আশ্রয় ॥

অনুবাদ

এভাবেই ক্ষেত্র, জ্ঞান ও জ্ঞেয়—এই তিনটি তত্ত্ব সংক্ষেপে বলা হল। আমার ভক্তই কেবল এই সমস্ত বিদিত হয়ে আমার ভাব লাভ করেন।

তাৎপর্য

ভগবান এখানে ক্ষেত্র (শরীর), জ্ঞান ও জ্ঞেয়—এই তিনটি তত্ত্বের সংক্ষিপ্তসার বর্ণনা করেছেন। এই জ্ঞান হচ্ছে তিনটি বিষয়ের—জ্ঞাতা, জ্ঞাতব্য ও জ্ঞান আহরণের পন্থা। যুক্তভাবে এদের বলা হয় বিজ্ঞান। ভগবানের অনন্য ভক্ত সরাসরিভাবে শুদ্ধ জ্ঞান উপলব্ধি করতে পারেন, কিন্তু অন্যদের পক্ষে এই জ্ঞান লাভ করা সম্ভব নয়। অদ্বৈতবাদীরা বলে থাকেন যে, পরম স্তরে এই তিনটি

বিষয় এক হয়ে যায়। কিন্তু ভগবদ্ভক্তেরা সেই কথা স্বীকার করেন না। জ্ঞান এবং জ্ঞানের বিকাশের অর্থ হচ্ছে, কৃষ্ণভাবনামৃতের আলোকে নিজেকে উপলব্ধি করা। আমরা জড় চেতনার দ্বারা পরিচালিত হচ্ছি, কিন্তু আমরা যখনই আমাদের সমস্ত চেতনা কৃষ্ণোন্মুখী করে তুলি এবং শ্রীকৃষ্ণকে সর্ব কারণের পরম কারণরূপে উপলব্ধি করতে পারি, তখনই আমরা যথার্থ জ্ঞান প্রাপ্ত হই। পক্ষান্তরে বলা যায়, জ্ঞান হচ্ছে যথার্থভাবে ভগবদ্ভক্তি উপলব্ধি করার প্রারম্ভিক স্তর। পঞ্চদশ অধ্যায়ে এই বিষয়টি খুব পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করা হবে।

এখন, আলোচনার সারসংক্ষেপ করতে গেলে, বোঝবার চেষ্টা করতে হবে যে, *মহাভূতানি* থেকে শুরু করে *চেতনা ধৃতিঃ* পর্যন্ত ৬ ও ৭ শ্লোকে জড় উপাদানগুলি ও জীবন-লক্ষণের কয়েকটি অভিব্যক্তির বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এগুলির সমন্বয়ে দেহ অর্থাৎ কর্মক্ষেত্র গঠিত হয়। আর *অমানিত্বম্* থেকে *তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্* পর্যন্ত ৮ থেকে ১২ শ্লোকে জীবাত্মা ও পরমাত্মা রূপী উভয় ক্ষেত্রজ্ঞের স্বরূপ উপলব্ধি অর্জনের উপযোগী জ্ঞান আহরণের পন্থা বিবৃত হয়েছে। তার পরে *অনাদি মৎপরম্* থেকে আরম্ভ করে *হৃদি সর্বস্য বিষ্ঠিতম্ পর্যন্ত* ১৩ থেকে ১৮ শ্লোকে জীবাত্মা ও পরমেশ্বর ভগবান অর্থাৎ পরমাত্মার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

এভাবেই তিনটি বিষয় বর্ণিত হয়েছে—ক্ষেত্র (শরীর), জ্ঞান উপলব্ধির পন্থা এবং জীবাত্মা ও পরমাত্মা। এখানে বিশেষভাবে বোঝানো হয়েছে যে, কেবলমাত্র ভগবানের শুদ্ধ ভক্তেরাই এই তিনটি বিষয় পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারেন। সুতরাং, এই সব ভক্তদের কাছে *ভগবদ্গীতা* অত্যন্ত প্রয়োজনীয়; তাঁরাই পরম লক্ষ্য পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের ভাব লাভ করতে পারেন। অন্যভাবে বলতে গেলে, আর কেউ নয়, কেবলমাত্র ভক্ত-জনেরাই *ভগবদ্গীতা* বুঝতে পারেন এবং বাঞ্ছিত ফল লাভ করতে পারেন।

শ্লোক ২০

প্রকৃতিং পুরুষং চৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি ।
বিকারাংশ্চ গুণাংশ্চৈব বিদ্ধি প্রকৃতিসম্ভবান্ ॥ ২০ ॥

প্রকৃতিম্—জড়া প্রকৃতি; **পুরুষম্**—পুরুষ; **চ**—ও; **এব**—অবশ্যই; **বিদ্ধি**—জানবে; **অনাদী**—আদিহীন; **উভৌ**—উভয়; **অপি**—ও; **বিকারান্**—বিকার; **চ**—ও; **গুণান্**—প্রকৃতির তিনটি গুণ; **চ**—ও; **এব**—অবশ্যই; **বিদ্ধি**—জানবে; **প্রকৃতি**—জড়া প্রকৃতি; **সম্ভবান্**—উদ্ভূত।

গীতার গান

প্রকৃতি পুরুষ হয় অনাদি সে সিদ্ধ ।
অনাদি কাল হতে উভয় সংবৃদ্ধ ॥
বিকারাদি গুণ যত প্রাকৃত সম্ভব ।
প্রাকৃত পুরুষ যেই তার অনুভব ॥

অনুবাদ

প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়ই অনাদি বলে জানবে। তাদের বিকার ও গুণসমূহ প্রকৃতি থেকেই উৎপন্ন বলে জানবে।

তাৎপর্য

এই অধ্যায়ে প্রদত্ত জ্ঞানের মাধ্যমে দেহ (কর্মক্ষেত্র) ও ক্ষেত্রজ্ঞ (জীবাত্মা, পরমাত্মা উভয়ই) সম্বন্ধে জানা যায়। দেহ হচ্ছে কর্মক্ষেত্র এবং তা জড় উপাদান দিয়ে তৈরি। দেহে আবদ্ধ হয়ে কর্মফল ভোগ করছে যে স্বতন্ত্র আত্মা, সেই হচ্ছে *পুরুষ* বা জীব। জীবাত্মাকে বলা হয় ক্ষেত্রজ্ঞ এবং অপর ক্ষেত্রজ্ঞ হচ্ছেন পরমাত্মা। আমাদের অবশ্য জানতে হবে যে, পরমাত্মা ও জীবাত্মা উভয়েই পরম পুরুষ ভগবানের বিভিন্ন প্রকাশ। জীব হচ্ছে তাঁর শক্তিতত্ত্ব এবং পরমাত্মা হচ্ছেন তাঁর স্বাংশ-প্রকাশ।

জড়া প্রকৃতি ও জীব উভয়েই নিত্য, অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্বেও তাদের অস্তিত্ব ছিল। পরমেশ্বর ভগবানের শক্তি থেকেই জড়া প্রকৃতি প্রকাশিত হয়েছে এবং জীবও তেমনই। কিন্তু জীব হচ্ছে ভগবানের উৎকৃষ্ট শক্তিসম্ভূত। সৃষ্টির পূর্বে তারা উভয়েই ছিল। জড়া প্রকৃতি নিহিত ছিল পরমেশ্বর ভগবান মহাবিষ্ণুর মধ্যে এবং মহাবিষ্ণুর ইচ্ছার ফলে মহৎ-তত্ত্বের মাধ্যমে আবার তার প্রকাশ হয়। তেমনই, জীবেরাও তাঁর মধ্যে আছে, কিন্তু যেহেতু তারা বদ্ধ অবস্থায় রয়েছে, তাই তারা ভগবানের সেবাবিমুখ। তাই, তাদের চিদাকাশে প্রবেশ করতে দেওয়া হয় না। কিন্তু জড়া প্রকৃতিতে আসার ফলে এই সমস্ত জীবকে আবার জড় জগতে কর্ম করবার সুযোগ দেওয়া হয়, যাতে তারা চিৎ-জগতে প্রবেশ করবার জন্য নিজেদের তৈরি করে নিতে পারে। সেটিই হচ্ছে এই জড় সৃষ্টির রহস্য। প্রকৃতপক্ষে জীব হচ্ছে মূলত ভগবানের চিন্ময় বিভিন্ন অংশ। কিন্তু তার বিদ্রোহীসুলভ প্রকৃতির জন্য সে এই জড়া প্রকৃতিতে আবদ্ধ হয়ে পড়েছে। ভগবানের উৎকৃষ্টা শক্তিজাত এই সমস্ত জীব যে কেন এবং কিভাবে এই জড় জগতের সংস্পর্শে এল তা নিয়ে

মাথা ঘামাবার কোন প্রয়োজন নেই। কিন্তু পরম পুরুষোত্তম ভগবান অবশ্য জানেন কেন এবং কিভাবে তা ঘটল। শাস্ত্রে ভগবান বলেছেন যে, যারা জড় জগতের প্রতি আকৃষ্ট, তারা জীবন ধারণের জন্য কঠোর সংগ্রাম করছে। কিন্তু এই কয়েকটি শ্লোকের মাধ্যমে আমাদের নিশ্চিতভাবে জানা উচিত যে, জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণের প্রভাবে যে সমস্ত পরিবর্তন ঘটছে তা সবই জড়া প্রকৃতির দ্বারা পরিচালিত। জীবের সমস্ত রূপান্তর ও বৈচিত্র্য সবই দৈহিক। আত্মার পরিপ্রেক্ষিতে সমস্ত জীবই এক রকম।

শ্লোক ২১

কার্যকারণকর্তৃত্বে হেতুঃ প্রকৃতিরুচ্যতে ।
পুরুষঃ সুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুরুচ্যতে ॥ ২১ ॥

কার্য—কার্য; **কারণ**—কারণ; **কর্তৃত্বে**—কর্তৃত্ব বিষয়ে; **হেতুঃ**—হেতু; **প্রকৃতিঃ**—জড়া প্রকৃতিকে; **উচ্যতে**—বলা হয়; **পুরুষঃ**—জীবকে; **সুখ**—সুখ; **দুঃখানাম্**—দুঃখের; **ভোক্তৃত্বে**—ভোগ বিষয়ে; **হেতুঃ**—হেতু; **উচ্যতে**—বলা হয়।

গীতার গান

কার্য বা কারণ হয় প্রকৃতির দান ।
ভোগের কারণ সেই পুরুষেই হন ॥

অনুবাদ

সমস্ত জড়ীয় কার্য ও কারণের কর্তৃত্ব বিষয়ে প্রকৃতিকে হেতু বলা হয়, তেমনিই জড়ীয় সুখ ও দুঃখের ভোগ বিষয়ে জীবকে হেতু বলা হয়।

তাৎপর্য

জীবের ভিন্ন ভিন্ন শরীর ও ইন্দ্রিয়ের প্রকাশ হয় জড়া প্রকৃতির প্রভাবে। চুরাশি লক্ষ বিভিন্ন প্রজাতির জীব আছে এবং তা প্রকৃতিরই সৃষ্টি। জীব তার ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের বাসনা অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন শরীর প্রাপ্ত হয়। ভিন্ন ভিন্ন শরীরে তখন সে বিভিন্ন রকমের সুখ ও দুঃখ অনুভব করে। তার এই সুখ ও দুঃখের কারণ তার জড় দেহ এবং সেই অনুভূতিগুলি তার নিজের নয়। তার স্বরূপে সে যে নিত্য আনন্দময়, সেই সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। তাই সেটি হচ্ছে তার স্বাভাবিক

অবস্থা। কিন্তু জড় জগতের উপর আধিপত্য করার বাসনার ফলে জীব জড় জগতে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। চিৎ-জগতে এই সমস্ত বন্ধনের কোন প্রশ্নই ওঠে না। চিৎ-জগৎ হচ্ছে চিরপবিত্র, কিন্তু জড় জগতে সকলেই তাদের দেহগত ইন্দ্রিয়সুখ উপভোগের জন্য সংগ্রাম করে চলেছে। আরও স্পষ্টভাবে বলা যায় যে, এই দেহটি হচ্ছে ইন্দ্রিয়ের পরিণাম। ইন্দ্রিয়গুলি হচ্ছে কামনা-বাসনা চরিতার্থ করার যন্ত্র। তাই দেহ ও যন্ত্রতুল্য ইন্দ্রিয়গুলি জড়া প্রকৃতির দান। পরবর্তী শ্লোকে বিশ্লেষণ করা হবে যে, জীব তার পূর্বকৃত কর্ম এবং বাসনা অনুসারে সুখ অথবা দুঃখ ভোগ করে। জীবের কামনা ও কর্ম অনুসারে জড়া প্রকৃতি তাকে বিভিন্ন আবাসনে প্রেরণ করে। এই সমস্ত আবাসনগুলি অর্জনের জন্য জীব নিজেই দায়ী এবং সেই অনুসারে সে সুখ ও দুঃখ ভোগ করে থাকে। কোন বিশেষ জড় শরীর প্রাপ্ত হলেই জীব প্রকৃতির নিয়ন্ত্রণাধীন হয়ে পড়ে, কারণ তার দেহটি জড় পদার্থ বলেই জড়া প্রকৃতির নিয়ম অনুসারে তাকে পরিচালিত হতে হয়। তখন সেই নিয়ম পরিবর্তন করার কোন শক্তি জীবের থাকে না। যেমন, কোন জীবকে কুকুরের দেহে রাখা হল। যখনই তাকে কুকুরের দেহে রাখা হল, তখন তাকে কুকুরের মতোই আচরণ করতে হবে। অন্য কোন রকম আচরণ সে আর তখন করতে পারে না। অথবা কোন জীবকে যদি শূকরের দেহে রাখা হয়, তখন সে শূকরের মতো বিষ্ঠা খেতে আর সেভাবেই কাজ করতে বাধ্য হয়। তেমনই, কোন জীবকে যদি দেবতা শরীরে রাখা হয়, তখন তাকে তার সেই দেহ অনুসারে আচরণ করতে হয়। এটিই হচ্ছে প্রকৃতির নিয়ম। কিন্তু সর্ব অবস্থাতেই পরমাত্মা জীবাত্মার সঙ্গে রয়েছেন। *বেদে* (*মুণ্ডক উপনিষদ* ৩/১/১) তার ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে—*দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া*। পরমেশ্বর ভগবান জীবের প্রতি এতই দয়াশীল যে, তিনি সর্বদাই তার পরম বন্ধুর মতো পরমাত্মা রূপে তার সঙ্গে সঙ্গে থাকেন।

শ্লোক ২২

পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি ভুঙ্ক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্ ।
কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্‌যোনিজন্মসু ॥ ২২ ॥

পুরুষঃ—জীব; **প্রকৃতিস্থঃ**—জড়া প্রকৃতিতে অবস্থিত হয়ে; **হি**—অবশ্যই; **ভুঙ্ক্তে**—ভোগ করে; **প্রকৃতিজান্**—প্রকৃতিজাত; **গুণান্**—গুণসমূহ; **কারণম্**—কারণ; **গুণসঙ্গঃ**—প্রকৃতির গুণের সঙ্গ প্রভাবে; **অস্য**—এই জীবের; **সদসদ্**—ভাল ও মন্দ; **যোনি**—যোনিতে; **জন্মসু**—জন্ম হয়।

গীতার গান

প্রাকৃত হইয়া জীব ভুঞ্জে সেই গুণ ।
প্রকৃতির গুণ সব প্রকৃতির দান ॥
প্রাকৃত গুণের সঙ্গ উচ্চনীচ যোনি ।
সদসদ্ জন্ম হয় অন্য নাহি গণি ॥

অনুবাদ

জড়া প্রকৃতিতে অবস্থিত হয়ে জীব প্রকৃতিজাত গুণসমূহ ভোগ করে। প্রকৃতির গুণের সঙ্গবশতই তার সৎ ও অসৎ যোনিসমূহে জন্ম হয়।

তাৎপর্য

জীব কিভাবে এক দেহ থেকে আর এক দেহে দেহান্তরিত হয় তা বোঝার জন্য এই শ্লোকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দ্বিতীয় অধ্যায়ে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, পোশাক পরিবর্তন করার মতো জীব এক দেহ থেকে আর এক দেহে দেহান্তরিত হয়। জড় অস্তিত্বের প্রতি আসক্তিই হচ্ছে এই পোশাক পরিবর্তনের কারণ। জীব যতক্ষণ এই ভ্রান্ত প্রকৃতির দ্বারা মোহাচ্ছন্ন থাকে, ততক্ষণ তাকে এক দেহ থেকে আর এক দেহে দেহান্তরিত হতে হয়। জড় জগতের উপর আধিপত্য করার দুরাশার ফলে সে এই রকম অবাঞ্ছিত অবস্থায় পতিত হয়। জাগতিক কামনা-বাসনার প্রভাবে সে কখনও দেবতারূপে জন্মগ্রহণ করে, কখনও মানুষরূপে জন্মগ্রহণ করে এবং কখনও পশু, পাখি, জলচর প্রাণী, পতঙ্গ, সাধুসন্ত অথবা পোকা-মাকড় অথবা ছাড়পোকা রূপে জন্মগ্রহণ করে। সর্বক্ষণই এই দেহান্তর ঘটে চলেছে আর সর্ব অবস্থাতেই জীব মনে করছে যে, সে তার পারিপার্শ্বিক অবস্থার নিয়ন্তা। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সর্ব অবস্থাতেই সে জড়া প্রকৃতির নিয়ন্ত্রণাধীন।

কিভাবে জীব বিভিন্ন শরীর প্রাপ্ত হয়, সেই কথা এখানে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। তার বিভিন্ন শরীর প্রাপ্তির কারণ হচ্ছে, প্রকৃতির বিভিন্ন গুণের সঙ্গে তার আসঙ্গ। তাই প্রকৃতির তিনটি গুণের ঊর্ধ্বে উন্নীত হয়ে গুণাতীত অপ্রাকৃত স্তরে অধিষ্ঠিত হতে হবে। তাকেই বলা হয় কৃষ্ণচেতনা। কৃষ্ণচেতনায় অধিষ্ঠিত না হলে তার জড় চেতনা তাকে এক দেহ থেকে আর এক দেহে দেহান্তরিত হতে বাধ্য করবে, কারণ অনাদি কাল ধরে তার হৃদয়ে জড় কামনা-বাসনাগুলি রয়ে গেছে। তাই তার এই চেতনার পরিবর্তন করতে হবে। সেই পরিবর্তন সম্ভব হয় কেবল নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে শ্রবণ করার মাধ্যমে। তার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন এখানে

দেওয়া হয়েছে—অর্জুন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছ থেকে ভগবৎ-তত্ত্বজ্ঞান শ্রবণ করেছেন। জীব যদি এই শ্রবণের পন্থা অবলম্বন করে, তা হলে সে জড় জগতের উপর আধিপত্য করার চির-পুরাতন বাসনা ত্যাগ করতে সক্ষম হয় এবং জড় জগতের উপর তার আধিপত্য করার বাসনা যত কমতে থাকে, সেই অনুপাতে সে দিব্য আনন্দ অনুভব করে থাকে। একটি বৈদিক মন্ত্রে বলা হয়েছে যে, পরম পুরুষোত্তম ভগবানের সঙ্গ লাভে তার জ্ঞান যতই বর্ধিত হয়, ততই সে নিত্য আনন্দময় জীবন আস্বাদন করে থাকে।

শ্লোক ২৩

উপদ্রষ্টানুমন্তা চ ভর্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ ।
পরমাত্মেতি চাপ্যুক্তো দেহেঽস্মিন্ পুরুষঃ পরঃ ॥ ২৩ ॥

উপদ্রষ্টা—সাক্ষী; **অনুমন্তা**—অনুমোদনকারী; **চ**—ও; **ভর্তা**—পালক; **ভোক্তা**—ভোগকর্তা; **মহেশ্বরঃ**—পরমেশ্বর; **পরমাত্মা**—পরমাত্মা; **ইতি**—এভাবে; **চ**—এবং; **অপি**—ও; **উক্তঃ**—বলা হয়; **দেহে**—শরীরে; **অস্মিন্**—এই; **পুরুষঃ**—পুরুষ; **পরঃ**—পরম।

গীতার গান

সে জীবের বদ্ধরূপে পরমাত্মা সঙ্গে ।
উপদেষ্টা অনুমন্তা হন তিনি রঙ্গে ॥
মহেশ্বর তিনি ভোক্তা পুরুষে পরম ।
জীবের উদ্ধার লাগি তিনি সঙ্গে হন ॥

অনুবাদ

এই শরীরে আর একজন পরম পুরুষ রয়েছেন, যিনি হচ্ছেন উপদ্রষ্টা, অনুমন্তা, ভর্তা, ভোক্তা, মহেশ্বর এবং তাঁকে পরমাত্মাও বলা হয়।

তাৎপর্য

এখানে বলা হচ্ছে যে, পরমাত্মা যিনি সর্বক্ষণ জীবের সঙ্গে থাকেন, তিনি পরমেশ্বর ভগবানের প্রকাশ। তিনি একজন সাধারণ জীব নন। অদ্বৈতবাদী দার্শনিকেরা যেহেতু ক্ষেত্রজ্ঞকে এক বলে মনে করেন, তাই তাঁদের মতে জীবাত্মা ও পরমাত্মার

মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। সেই পার্থক্য স্পষ্টভাবে বোঝাবার জন্য ভগবান এখানে বলেছেন যে, তিনি পরমাত্মা রূপে প্রতিটি দেহে বিরাজ করেন। জীবাত্মা থেকে তিনি পৃথক; তিনি *পর* অর্থাৎ প্রপঞ্চাতীত। জীবাত্মা কোন বিশেষ ক্ষেত্রের কার্যকলাপ উপভোগ করে থাকেন। কিন্তু পরমাত্মা সীমিত ভোক্তা বা দেহের কর্মফলের ভোক্তারূপে থাকেন না, তিনি বিরাজ করেন সাক্ষী, পর্যবেক্ষক, অনুমোদনকারী ও পরম ভোক্তারূপে। তাঁর নাম হচ্ছে পরমাত্মা, জীবাত্মা নয়। তিনি প্রপঞ্চাতীত। এখানে স্পষ্টভাবে বোঝানো হয়েছে যে, আত্মা ও পরমাত্মা ভিন্ন। পরমাত্মার হস্ত ও পদ সর্বত্রই আছে, কিন্তু জীবের তা নেই। যেহেতু পরমাত্মা পরমেশ্বর ভগবান, তাই তিনি প্রতিটি জীবের অন্তরে থেকে জীবাত্মার ভোগ বাসনাগুলি মঞ্জুর করেন। পরমাত্মার অনুমোদন ব্যতীত জীবাত্মা কিছুই করতে পারে না। জীবাত্মা হচ্ছে ভুক্ত বা প্রতিপালিত এবং ভগবান হচ্ছেন ভোক্তা বা প্রতিপালক। অসংখ্য জীব আছে এবং তিনি তাদের পরম সুহৃদরূপে তাদের অন্তরে বিরাজ করেন।

প্রতিটি স্বতন্ত্র জীব হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের সনাতন বিভিন্নাংশ এবং তারা উভয়েই একে অপরের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। কিন্তু জীবের মধ্যে ভগবানের অনুমোদন প্রত্যাহার করার প্রবণতা রয়েছে এবং সে স্বাধীনভাবে জড়া প্রকৃতির উপর আধিপত্য করার বাসনা করে। যেহেতু তার এই প্রবণতা রয়েছে, তাই তাকে বলা হয় পরমেশ্বর ভগবানের তটস্থা শক্তি। জীব ভগবানের জড়া শক্তি নতুবা তাঁর পরা শক্তিতে অবস্থান করতে পারে। যখন সে জড়া শক্তির বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়ে, তখন পরমেশ্বর ভগবান তাঁকে তাঁর পরা প্রকৃতিতে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্য তার পরম বন্ধু পরমাত্মা রূপে তার সঙ্গে সঙ্গে থাকেন। ভগবান জীবকে পরা প্রকৃতিতে নিয়ে যাবার জন্য সর্বদাই উদ্‌গ্রীব, কিন্তু জীব তার যৎপরোনাস্তি ক্ষুদ্র স্বাতন্ত্র্যের প্রভাবে প্রতিনিয়ত পরম চিন্ময় জ্যোতিস্বরূপ ভগবানের সঙ্গ প্রত্যাখ্যান করছে। তার স্বাতন্ত্র্যের অপব্যবহার করার ফলেই জীব এই জড়া প্রকৃতিতে সংসার-দুঃখ ভোগ করছে। ভগবান তাই সর্বক্ষণ তার অন্তরে থেকে এবং বাইরে থেকে উপদেশ দিচ্ছেন। বাইরে থেকে তিনি *ভগবদ্‌গীতা* রূপে উপদেশ দিচ্ছেন এবং অন্তর থেকে তিনি জীবের দৃঢ় প্রত্যয় উৎপাদন করার চেষ্টা করছেন যে, এই জড় জগতে তার কোন কর্ম আনন্দ দানের পক্ষে উপযোগী নয়। তিনি বলছেন, "এই সব কিছু পরিত্যাগ করে আমার প্রতি বিশ্বাসভাজন হও, তা হলেই তুমি সুখী হতে পারবে।" এভাবেই বুদ্ধিমান ব্যক্তি পরমাত্মা বা পরম পুরুষোত্তম ভগবানের প্রতি তাঁর বিশ্বাস অর্পণ করে সৎ-চিৎ-আনন্দময় জীবনের দিকে অগ্রসর হতে শুরু করেন।

শ্লোক ২৪

য এবং বেত্তি পুরুষং প্রকৃতিং চ গুণৈঃ সহ ।
সর্বথা বর্তমানোঽপি ন স ভূয়োঽভিজায়তে ॥ ২৪ ॥

যঃ—যিনি; **এবম্**—এভাবেই; **বেত্তি**—জানেন; **পুরুষম্**—পুরুষকে; **প্রকৃতিম্**—জড়া প্রকৃতিকে; **চ**—এবং; **গুণৈঃ**—গুণ; **সহ**—সহ; **সর্বথা**—সর্বতোভাবে; **বর্তমানঃ**—বিদ্যমান হয়ে; **অপি**—ও; **ন**—না; **সঃ**—তিনি; **ভূয়ঃ**—পুনরায়; **অভিজায়তে**—জন্মগ্রহণ করেন।

গীতার গান

সেই সে জ্ঞানের দ্বারা পুরুষ প্রকৃতি ।
পুরুষের যে প্রাকৃত গুণের স্বীকৃতি ॥
যে বুঝিল বর্তমান হইয়া সর্বথা ।
পুনর্জন্ম নাহি তার নহে সে অন্যথা ॥

অনুবাদ

যিনি এভাবেই পুরুষকে এবং গুণাদি সহ জড়া প্রকৃতিকে অবগত হন, তিনি জড় জগতে বর্তমান হয়েও পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করেন না।

তাৎপর্য

জড়া প্রকৃতি, পরমাত্মা, জীবাত্মা এবং তাদের পরস্পরের সম্পর্ক সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞান লাভ করতে পারলে মুক্তি লাভের যোগ্যতা অর্জন করা যায় এবং এই জগতে পুনরাবর্তিত হওয়ার বাধ্যবাধকতা অতিক্রম করে চিৎ-জগতে প্রবেশ করার যোগ্যতা অর্জন করা যায়। এটিই হচ্ছে যথার্থ জ্ঞানের পরিণতি। জ্ঞানের উদ্দেশ্য হচ্ছে, জীব যে ঘটনাচক্রে এই জড় জগতের বন্ধনে পতিত হয়েছে, তা স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করা। ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার প্রভাবে, সাধু, গুরু ও বৈষ্ণবের সঙ্গ করার ফলে মানুষ তার স্বরূপ সম্বন্ধে অবগত হতে পারে এবং প্রতিটি মানুষেরই কর্তব্য হচ্ছে পরম পুরুষোত্তম ভগবানের মুখনিঃসৃত *ভগবদ্গীতার* যথাযথ তাৎপর্য উপলব্ধি করে ভগবৎ-চেতনা বা কৃষ্ণভাবনামৃত লাভ করা। তা হলে তাকে আর জড় জগতের বন্ধনে ফিরে আসতে হয় না। সেই সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। তখন তিনি সচ্চিদানন্দময় জীবন লাভ করবার জন্য চিন্ময় জগতে ফিরে যাবেন।

শ্লোক ২৫

ধ্যানেনাত্মনি পশ্যন্তি কেচিদাত্মানমাত্মনা ।
অন্যে সাংখ্যেন যোগেন কর্মযোগেন চাপরে ॥ ২৫ ॥

ধ্যানেন—ধ্যানের দ্বারা; **আত্মনি**—অন্তরে; **পশ্যন্তি**—দর্শন করেন; **কেচিৎ**—কেউ কেউ; **আত্মানম্**—পরমাত্মাকে; **আত্মনা**—মনের দ্বারা; **অন্যে**—অন্যেরা; **সাংখ্যেন যোগেন**—সাংখ্য-যোগের দ্বারা; **কর্মযোগেন**—কর্মযোগের দ্বারা; **চ**—ও; **অপরে**—অন্যেরা।

গীতার গান

ভক্তগণ চিদাশ্রয়ে সদা ধ্যানে রত ।
প্রেমচক্ষে পরমাত্মাকে দর্শন সতত ॥
সাংখ্যযোগী জ্ঞান দ্বারা আলোচনা করে ।
কর্মযোগী ভগবানে কর্মার্পণ করে ॥

অনুবাদ

কেউ কেউ পরমাত্মাকে অন্তরে ধ্যানের দ্বারা দর্শন করেন, কেউ সাংখ্য-যোগের দ্বারা দর্শন করেন এবং অন্যেরা কর্মযোগের দ্বারা দর্শন করেন।

তাৎপর্য

ভগবান অর্জুনকে বলছেন যে, আত্মজ্ঞান লাভের অনুসন্ধানী বদ্ধ জীবাত্মাদের দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যারা নাস্তিক, অজ্ঞাবাদী এবং সন্দেহবাদী, তারা সর্বতোভাবে তত্ত্বজ্ঞানশূন্য। কিন্তু যারা পারমার্থিক বিজ্ঞানে বিশ্বাসী, তাদের বলা হয় অন্তর্দর্শী ভক্ত, দার্শনিক ও নিষ্কাম কর্মী। যারা সর্বদা অদ্বৈতবাদের মতবাদ প্রতিষ্ঠা করবার চেষ্টা করে, তাঁদেরও নাস্তিক ও অজ্ঞাবাদী বলে গণ্য করা হয়। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, ভগবদ্ভক্তেরাই কেবল পারমার্থিক উপলব্ধির উন্নত স্তরে অধিষ্ঠিত। কারণ তাঁরা জানেন যে, এই জড়া প্রকৃতির ঊর্ধ্বে চিন্ময় ভগবৎ-ধাম রয়েছে, যেখানে পরম পুরুষ ভগবান নিত্য বিরাজমান এবং তিনি পরমাত্মা রূপে নিজেকে বিস্তার করে প্রতিটি জীবের অন্তরে বিরাজমান। তিনিই হচ্ছেন সর্বব্যাপী ভগবান। অবশ্য অনেক অধ্যাত্মবাদী আছেন, যাঁরা জ্ঞান আহরণের মাধ্যমে পরমতত্ত্ব উপলব্ধি করতে চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁরাও বিশ্বাসীদের দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত। নাস্তিক সাংখ্য দার্শনিকেরা জড় জগৎকে চব্বিশটি তত্ত্বরূপে বিশ্লেষণ করেন এবং

তাঁরা জীবাত্মাকে পঞ্চবিংশতি তত্ত্বরূপে বিশ্লেষণ করেন। যখন তাঁরা বুঝতে পারেন যে, জীবাত্মার প্রকৃতি হল জড়াতীত, তখন তাঁরা এটিও বুঝতে পারেন যে, জীবাত্মার ঊর্ধ্বে রয়েছেন পরম পুরুষোত্তম ভগবান। সেই ভগবান হচ্ছেন ষড়বিংশতি তত্ত্ব। এভাবেই ক্রমান্বয়ে কৃষ্ণভাবনামৃত লাভ করে তাঁরাও ভগবদ্ভক্তির স্তরে উন্নীত হন। যাঁরা নিষ্কাম কর্মী বা কর্মযোগী, তাঁরাও ঠিক পথেই অগ্রসর হচ্ছেন। কালক্রমে তাঁরাও কৃষ্ণভাবনায় ভক্তিযোগের স্তরে উন্নীত হবার সুযোগ পান। এখানে বলা হয়েছে যে, কিছু মানুষ আছেন যাঁদের চিত্তবৃত্তি নির্মল এবং তাঁরা ধ্যানের মাধ্যমে পরমাত্মাকে উপলব্ধি করতে চেষ্টা করেন। তাঁরা যখন হৃদয়ে পরমাত্মাকে খুঁজে পান, তখন তাঁরা চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত হন। তেমনই, অনেকে আছেন, যাঁরা জ্ঞানের মাধ্যমে পরমাত্মাকে উপলব্ধি করার চেষ্টা করেন। কেউ আবার হঠযোগ অভ্যাস করার মাধ্যমে ভগবানকে জানতে চান এবং কেউ আবার শিশুসুলভ কার্যকলাপের মাধ্যমে পরম পুরুষোত্তম ভগবানকে সন্তুষ্ট করতে চেষ্টা করেন।

শ্লোক ২৬

অন্যে ত্বেবমজানন্তঃ শ্রুত্বান্যেভ্য উপাসতে ।
তেঽপি চাতিতরন্ত্যেব মৃত্যুং শ্রুতিপরায়ণাঃ ॥ ২৬ ॥

অন্যে—অন্যেরা; **তু**—কিন্তু; **এবম্**—এভাবেই; **অজানন্তঃ**—না জেনে; **শ্রুত্বা**—শ্রবণ করে; **অন্যেভ্যঃ**—অন্যদের কাছ থেকে; **উপাসতে**—উপাসনা করেন; **তে**—তাঁরা; **অপি**—ও; **চ**—এবং; **অতিতরন্তি**—অতিক্রম করেন; **এব**—অবশ্যই; **মৃত্যুম্**—মৃত্যুময় সংসার; **শ্রুতিপরায়ণাঃ**—শ্রবণ-পরায়ণ হয়ে।

গীতার গান

অন্য সাধারণ লোক বুঝে না সে কিছু ।
শ্রবণান্তর উপাসনা তারা করে কিছু ॥
তারাও ত্বরিয়া যায় এ সংসার হতে ।
যদি শ্রুতিপরায়ণ সাধুর সঙ্গেতে ॥

অনুবাদ

অন্য কেউ কেউ এভাবেই না জেনে অন্যদের কাছ থেকে শ্রবণ করে উপাসনা করেন। তাঁরাও শ্রবণ-পরায়ণ হয়ে মৃত্যুময় সংসার অতিক্রম করেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি আধুনিক সমাজের পক্ষে বিশেষভাবে প্রযোজ্য, কারণ বর্তমান সমাজে বাস্তবিকপক্ষে পারমার্থিক বিষয় সম্বন্ধে কোন রকম শিক্ষাই দেওয়া হয় না। কিছু কিছু লোককে নাস্তিক অথবা অজ্ঞাবাদী অথবা দার্শনিক বলে মনে হতে পারে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাদের কোন রকম দার্শনিক জ্ঞানই নেই। সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে, কোন মানুষ যদি পুণ্যাত্মা হন, তা হলে শ্রবণ করার মাধ্যমে তিনি পরমার্থ সাধনের পথে একটি সুযোগ পেতে পারেন। এই শ্রবণের পন্থা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, যিনি বর্তমান জগতে কৃষ্ণভাবনামৃত প্রচার করে গেছেন, তিনি ভগবানের কথা শ্রবণ করার উপর বিশেষভাবে জোর দিয়েছেন। কারণ, সাধারণ মানুষ যদি কেবল সাধু, গুরু, বৈষ্ণবের কাছ থেকে ভগবানের কথা শ্রবণ করেন, তা হলে পারমার্থিক পথে অগ্রসর হতে পারেন, বিশেষ করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নির্দেশ অনুসারে তাঁরা যদি অপ্রাকৃত শব্দ তরঙ্গ—**হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে / হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে**—নিষ্ঠার সঙ্গে শ্রবণ করেন। তাই বলা হয়েছে যে, সকলেরই উচিত আত্মজ্ঞানী পুরুষের কাছে ভগবানের কথা শ্রবণ করা এবং তত্ত্বজ্ঞান উপলব্ধি করার যোগ্যতা অর্জন করা। তখন তাঁরা আপনা থেকেই পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা শুরু করবেন। সেই সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন যে, এই কলিযুগে কাউকেই তার অবস্থার পরিবর্তন করতে হবে না। তবে অনুমানের মাধ্যমে পরমেশ্বর ভগবানকে উপলব্ধি করার সব রকম চেষ্টা পরিত্যাগ করতে হবে। যাঁরা ভগবৎ-তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেছেন, তাঁদের সেবক হওয়ার শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। কেউ যদি অসীম সৌভাগ্যের ফলে কোন শুদ্ধ ভক্তের চরণাশ্রয় লাভ করেন, তাঁর মুখারবিন্দ থেকে আত্মজ্ঞান শ্রবণ করেন এবং তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করেন, তা হলে তিনি ধীরে ধীরে শুদ্ধ ভক্তের পর্যায়ে উন্নীত হবেন। এই শ্লোকে শ্রবণ করার পন্থা বিশেষভাবে অনুমোদিত হয়েছে। এই শ্রবণের পন্থা খুবই যথাযথ। সাধারণ মানুষ যদিও তথাকথিত দার্শনিকদের মতো দক্ষ নাও হন, তবুও শ্রদ্ধা ভরে সাধু-গুরু-বৈষ্ণবের মুখারবিন্দ থেকে ভগবানের কথা শ্রবণ করার ফলে তাঁরা এই জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে তাঁদের প্রকৃত আলয় ভগবৎ-ধামে ফিরে যাবেন।

শ্লোক ২৭

যাবৎ সংজায়তে কিঞ্চিৎ সত্ত্বং স্থাবরজঙ্গমম্ ।
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞসংযোগাৎ তদ্বিদ্ধি ভরতর্ষভ ॥ ২৭ ॥

যাবৎ—যা কিছু; **সংজায়তে**—উৎপন্ন হয়; **কিঞ্চিৎ**—কোন কিছু; **সত্ত্বম্**—অস্তিত্ব; **স্থাবর**—স্থাবর; **জঙ্গমম্**—জঙ্গম; **ক্ষেত্র**—দেহ; **ক্ষেত্রজ্ঞ**—ক্ষেত্রজ্ঞের; **সংযোগাৎ**—সংযোগ থেকে; **তৎ**—তা; **বিদ্ধি**—জানবে; **ভরতর্ষভ**—হে ভারতশ্রেষ্ঠ।

গীতার গান

স্থাবর জঙ্গম যত জন্মেছে জন্মাবে ।
ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগ প্রভাবে ॥

অনুবাদ

হে ভারতশ্রেষ্ঠ! স্থাবর ও জঙ্গম যা কিছু অস্তিত্ব আছে, তা সবই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগ থেকে উৎপন্ন হয়েছে বলে জানবে।

তাৎপর্য

জড়া প্রকৃতি ও জীব উভয়েই সৃষ্টির পূর্বে বর্তমান ছিল, তাদের সম্বন্ধে এই শ্লোকে ব্যাখ্যা করা হচ্ছে। যা কিছু সৃষ্টি হয়েছে তা কেবল জড়া প্রকৃতি ও জীবের সমন্বয় মাত্র। প্রকৃতিতে গাছপালা, পাহাড় ও পর্বতের মতো অনেক কিছু আছে, যা স্থাবর বা গতিশীল নয় এবং অনেক কিছু আছে যা জঙ্গম বা গতিশীল। তারা সকলেই জড়া প্রকৃতি এবং পরা প্রকৃতি জীবাত্মার সমন্বয় ছাড়া আর কিছুই নয়। পরা প্রকৃতি জীবাত্মার সংস্পর্শ ছাড়া কোন কিছুরই বিকাশ হতে পারে না। জড়া প্রকৃতির সঙ্গে পরা প্রকৃতির যে সম্পর্ক তা নিত্যকাল ধরে চলে আসছে এবং তাদের সমন্বয় সম্পাদিত হয় পরমেশ্বর ভগবানের ইচ্ছার প্রভাবে। তাই, তিনি উৎকৃষ্টা ও অনুৎকৃষ্টা উভয় প্রকৃতিরই নিয়ন্তা। তিনি জড়া প্রকৃতি সৃষ্টি করেছেন এবং উৎকৃষ্টা পরা প্রকৃতিকে তিনিই জড়া প্রকৃতিতে স্থাপন করেছেন এবং তাঁর ফলে এই সমস্ত কিছু প্রকাশিত হয়েছে এবং সক্রিয় হয়েছে।

শ্লোক ২৮

সমং সর্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরম্ ।
বিনশ্যৎস্ববিনশ্যন্তং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥ ২৮ ॥

সমম্—সমভাবে; **সর্বেষু**—সমস্ত; **ভূতেষু**—জীবে; **তিষ্ঠন্তম্**—অবস্থিত; **পরমেশ্বরম্**—পরমাত্মাকে; **বিনশ্যৎসু**—বিনাশশীলদের মধ্যে; **অবিনশ্যন্তম্**—অবিনাশী; **যঃ**—যিনি; **পশ্যতি**—দর্শন করেন; **সঃ**—তিনি; **পশ্যতি**—যথার্থ দর্শন করেন।

গীতার গান

সে সব ভূতেতে সমস্থিত ভগবান ।
দর্শন করিতে পারে কোন ভাগ্যবান ॥
ভগবান অবিনশ্যৎ বস্তু তাহার ভিতরে ।
বিনশ্যৎ ধর্ম তিনি স্বীকার না করে ॥

অনুবাদ

যিনি সর্বভূতে সমানভাবে অবস্থিত বিনাশশীল দেহের মধ্যেও অবিনাশী পরমাত্মাকে দর্শন করেন, তিনিই যথার্থ দর্শন করেন।

তাৎপর্য

সাধুসঙ্গের প্রভাবে যিনি দেহ, দেহী বা জীবাত্মা ও জীবাত্মার বন্ধু—এই তিনটি তত্ত্বের সমন্বয় দর্শন করতে পারেন, তিনিই যথার্থ জ্ঞান লাভ করেছেন। যে পারমার্থিক বিষয়ে প্রকৃত জ্ঞাতার সঙ্গ করে না, সে এই তিনটি জিনিস দেখতে পায় না। যারা তেমন সঙ্গ লাভ করে না, তারা অজ্ঞ হয়েই থাকে। তারা কেবল দেহটিই দর্শন করে এবং দেহটির যখন বিনাশ হয়ে যায়, তখন মনে করে যে, সব কিছুই শেষ হয়ে গেল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেটি তা নয়। দেহের বিনাশ হলেও আত্মা ও পরমাত্মা উভয়ই বর্তমান থাকেন এবং তাঁরা অনাদি কাল ধরে অসংখ্য স্থাবর ও জঙ্গম শরীরে ভ্রমণ করতে থাকেন। *পরমেশ্বর* এই সংস্কৃত শব্দটিকে কখনও কখনও 'জীবাত্মা' বলে অনুবাদ করা হয়, কারণ আত্মা হচ্ছে দেহের প্রভু এবং দেহের বিনাশের পরে সে অন্য একটি রূপ গ্রহণ করে। এভাবেই সে হচ্ছে প্রভু। কিন্তু *পরমেশ্বর* শব্দটিকে 'পরমাত্মা' বলে অন্যেরা ব্যাখ্যা করে থাকেন। দুটি ক্ষেত্রেই, পরমাত্মা ও জীবাত্মা উভয়েই থাকেন। তাঁদের বিনাশ হয় না। এভাবেই যিনি দর্শন করতে পারেন, তিনি প্রকৃতপক্ষে কি ঘটছে তা বুঝতে পারেন।

শ্লোক ২৯

সমং পশ্যন্ হি সর্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরম্ ।
ন হিনস্ত্যাত্মনাত্মানং ততো যাতি পরাং গতিম্ ॥ ২৯ ॥

সমম্—সমভাবে; **পশ্যন্**—দর্শন করে; **হি**—অবশ্যই; **সর্বত্র**—সর্বত্র; **সমবস্থিতম্**—সমভাবে অবস্থিত; **ঈশ্বরম্**—পরমাত্মাকে; **ন**—করেন না; **হিনস্তি**—অধঃপতন; **আত্মনা**—মনের দ্বারা; **আত্মানম্**—আত্মাকে; **ততঃ**—সেই হেতু; **যাতি**—লাভ করেন; **পরাম্**—পরম; **গতিম্**—গতি।

গীতার গান

সকলের মধ্যে সম থাকেন ঈশ্বর ।
দেখিতে সমর্থ হয় যেই তৎপর ॥
যে আত্মাকে অধঃপাত কভু নাহি করে ।
কুপথগামী সে দুষ্ট মন দ্বারে ॥

অনুবাদ

যিনি সর্বত্র সমভাবে অবস্থিত পরমাত্মাকে দর্শন করেন, তিনি কখনও মনের দ্বারা নিজেকে অধঃপতিত করেন না। এভাবেই তিনি পরম গতি লাভ করেন।

তাৎপর্য

জীবাত্মা তার জড়-জাগতিক অস্তিত্ব স্বীকার করে নিয়ে তার চিন্ময় অবস্থা থেকে ভিন্নতর অবস্থান লাভ করে। কিন্তু কেউ যখন বুঝতে পারে যে, পরমেশ্বর ভগবান তাঁর পরমাত্মা অংশ-প্রকাশরূপে সর্বত্র বিরাজিত, অর্থাৎ কেউ যখন সর্বভূতে পরমেশ্বর ভগবানকে দর্শন করতে পারেন, তখন আর তিনি বিনাশী মনোভাব নিয়ে নিজেকে অধঃপতিত করেন না এবং তাই তিনি তখন ধীরে ধীরে চিন্ময় জগতের দিকে অগ্রসর হতে থাকেন। মন সাধারণত ইন্দ্রিয়-তৃপ্তিমূলক ক্রিয়াকলাপে আসক্ত থাকে, কিন্তু সেই মন যখন ভগবন্মুখী হয়, তখন পারমার্থিক উপলব্ধির পথে অগ্রসর হওয়া যায়।

শ্লোক ৩০

প্রকৃত্যৈব চ কর্মাণি ক্রিয়মাণানি সর্বশঃ ।
যঃ পশ্যতি তথাত্মানমকর্তারং স পশ্যতি ॥ ৩০ ॥

প্রকৃত্যা—জড়া প্রকৃতির দ্বারা; **এব**—অবশ্যই; **চ**—ও; **কর্মাণি**—কর্মসমূহ; **ক্রিয়মাণানি**—ক্রিয়মাণ; **সর্বশঃ**—সর্বতোভাবে; **যঃ**—যিনি; **পশ্যতি**—দর্শন করেন;

তথা—এবং; **আত্মানম্**—আত্মাকে; **অকর্তারম্**—অকর্তা; **সঃ**—তিনি; **পশ্যতি**—যথাযথভাবে দর্শন করেন।

গীতার গান

প্রকৃতি প্রদত্ত দেহ ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা ।
প্রকৃতিই সাধে কর্ম জীবের সে সারা ॥
কিন্তু আত্মতত্ত্ব জীব কিছু নাহি করে ।
যাঁহার দর্শন সেই সে দেখিতে পারে ॥

অনুবাদ

যিনি দর্শন করেন যে, দেহের দ্বারা কৃত সমস্ত কর্মই প্রকৃতির দ্বারা সম্পাদিত হয় এবং আত্মা হচ্ছে অকর্তা, তিনিই যথাযথভাবে দর্শন করেন।

তাৎপর্য

এই দেহটি পরমাত্মার নির্দেশ অনুসারে জড়া প্রকৃতি দ্বারা সৃষ্ট হয়েছে এবং দেহের মাধ্যমে জীব যে সমস্ত কার্যকলাপ করে, সেগুলি সে নিজে করে না। সুখ অথবা দুঃখের জন্য সে যা-ই করুক, প্রকৃতপক্ষে তার দেহের গঠন অনুসারে সেটি করতে সে বাধ্য হয়। আত্মা কিন্তু সর্বদাই এই সমস্ত দৈহিক কার্যকলাপের ঊর্ধ্বে। কারও অতীত বাসনা অনুসারে তার দেহটি দেওয়া হয়েছে। কামনা-বাসনা চরিতার্থ করবার জন্য জীব তার জড় দেহ প্রাপ্ত হয়, যার দ্বারা সে কর্ম করে। বস্তুত বলা যায় যে, দেহটি হচ্ছে একটি যন্ত্র, যা জীবের মনোবাসনা চরিতার্থ করবার জন্য ভগবান বানিয়েছেন। বাসনার ফলে দুঃখ অথবা সুখ ভোগ করবার জন্য জীব নানা রকম সংকটপূর্ণ অবস্থায় পতিত হয়। কিন্তু জীবের এই দিব্যদৃষ্টি যখন বিকশিত হয়, তখন সে তার দেহের কার্যকলাপ থেকে নিজেকে পৃথকরূপে দর্শন করে। এই দৃষ্টিভঙ্গি যাঁর আছে, তিনি হচ্ছেন আসল দ্রষ্টা।

শ্লোক ৩১

যদা ভূতপৃথগ্‌ভাবমেকস্থমনুপশ্যতি ।
তত এব চ বিস্তারং ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা ॥ ৩১ ॥

যদা—যখন; **ভূত**—জীবগণের; **পৃথগ্‌ভাবম্**—পৃথক অস্তিত্ব; **একস্থম্**—একই

প্রকৃতিতে অবস্থিত; **অনুপশ্যতি**—দর্শন করেন; **ততঃ এব**—তা থেকে; **চ**—ও; **বিস্তারম্**—বিস্তার; **ব্রহ্ম**—ব্রহ্মভাব; **সম্পদ্যতে**—লাভ করেন; **তদা**—তখন।

গীতার গান

প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যে যেবা একত্ব দর্শনে ।
সর্বভূতের পৃথক ভাব সমর্থ সে মনে ॥
সৃষ্টি স্থিতি বিস্তার সেই যেবা জানে ।
সমর্থ সে জন দৃষ্টি ব্রহ্ম সম্পাদনে ॥

অনুবাদ

যখন বিবেকী পুরুষ জীবগণের পৃথক পৃথক অস্তিত্বকে একই প্রকৃতিতে অবস্থিত এবং একই প্রকৃতি থেকেই তাদের বিস্তার দর্শন করেন, তখন তিনি ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হন।

তাৎপর্য

কেউ যখন দর্শন করতে পারেন যে, জীব তার কামনা বাসনার ফলে নানা রকম জড় দেহ প্রাপ্ত হয় এবং আত্মার থেকে জড় দেহ পৃথক, তখনই তিনি যথাযথভাবে দর্শন করেন। জড়-জাগতিক জীবনে আমরা দেখি যে, কেউ দেবতা, কেউ মানুষ, কেউ কুকুর, কেউ বেড়াল ইত্যাদি। কিন্তু এটি হচ্ছে জড় দর্শন—যথার্থ দর্শন নয়। জীবন সম্বন্ধে জড় ধারণার ফলেই এই জড় বিভেদ প্রতিভাত হয়। জড় দেহের বিনাশ হয়ে যাবার পর, আত্মা একই থাকে। জড়া প্রকৃতির সংস্পর্শে আসার ফলে আত্মা নানা প্রকার শরীর প্রাপ্ত হয়। কেউ যখন তা দর্শন করতে পারেন, তখন তিনি দিব্যদৃষ্টি প্রাপ্ত হন। এভাবেই মানুষ, পশু, বড়, ছোট আদি পার্থক্য থেকে মুক্ত হয়ে তাঁর চেতনা তখন পরিশুদ্ধ হয় এবং তিনি তখন তাঁর চিন্ময় স্বরূপে কৃষ্ণভাবনামৃতে উন্নতি সাধন করতে সক্ষম হন। তখন তিনি কিভাবে সব কিছু দর্শন করেন, তা পরবর্তী শ্লোকে বর্ণনা করা হবে।

শ্লোক ৩২

অনাদিত্বান্নির্গুণত্বাৎ পরমাত্মায়মব্যয়ঃ ।
শরীরস্থোঽপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে ॥ ৩২ ॥

অনাদিত্বাৎ—অনাদিত্ব হেতু; **নির্গুণত্বাৎ**—নির্গুণত্ব হেতু; **পরম**—জড়া প্রকৃতির অতীত; **আত্মা**—আত্মা; **অয়ম্**—এই; **অব্যয়ঃ**—অব্যয়; **শরীরস্থঃ অপি**—শরীরে থেকেও; **কৌন্তেয়**—হে কুন্তীপুত্র; **ন করোতি**—কিছুই করে না; **ন লিপ্যতে**—লিপ্ত হয় না।

গীতার গান

ব্রহ্মজ্ঞানী জীব নিত্য পরম অব্যয় ।
নির্গুণ অনাদি তত্ত্ব নির্লিপ্ত সে রয় ॥

অনুবাদ

ব্রহ্মভাব অবস্থায় জীব তখন দর্শন করেন যে, অব্যয় এই আত্মা অনাদি, নির্গুণ ও জড়া প্রকৃতির অতীত। হে কৌন্তেয়! জড় দেহে অবস্থান করলেও আত্মা কোন কিছু করে না এবং কোন কিছুতেই লিপ্ত হয় না।

তাৎপর্য

জড় দেহের জন্ম হওয়ার ফলে মনে হয় যেন জীবের জন্ম হল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে জীব শাশ্বত, সনাতন, তার জন্ম হয় না এবং জড় দেহে স্থিত হলেও সে গুণাতীত ও শাশ্বত। তাই, তার কখনও বিনাশও হয় না। স্বভাবত সে হচ্ছে আনন্দময়। সে নিজে কোন রকম জড় কার্যে নিযুক্ত হয় না; তাই জড় শরীরের সংস্পর্শে আসার ফলে যে সমস্ত কার্য সম্পাদিত হয়, তা তাকে আবদ্ধ করতে পারে না।

শ্লোক ৩৩

যথা সর্বগতং সৌক্ষ্ম্যাদাকাশং নোপলিপ্যতে ।
সর্বত্রাবস্থিতো দেহে তথাত্মা নোপলিপ্যতে ॥ ৩৩ ॥

যথা—যেমন; **সর্বগতম্**—সর্বব্যাপ্ত; **সৌক্ষ্ম্যাৎ**—সূক্ষ্মতা হেতু; **আকাশম্**—আকাশ; **ন**—না; **উপলিপ্যতে**—লিপ্ত হয়; **সর্বত্র**—সর্বত্র; **অবস্থিতঃ**—অবস্থিত; **দেহে**—শরীরে; **তথা**—তেমন; **আত্মা**—আত্মা; **ন**—না; **উপলিপ্যতে**—লিপ্ত হয়।

গীতার গান

যেমন সর্বগত ব্যোম, সূক্ষ্ম তত্ত্ব অনুপম,
সর্বত্র সম্ভব বিচরণ ।

তথাপি সে লিপ্ত নহে, নিজের স্বতন্ত্র রহে,
সেইরূপ আত্ম বিচরণ ॥
সর্বত্র ব্যাপিয়া দেহে, কূটস্থ পৃথক রহে,
মহাভূতে নহে সে মিলন ।
তথা ব্রহ্মভূত জীব, আত্মতত্ত্বে হয়ে শিব,
দেহধর্মে লিপ্ত নাহি হন ॥

অনুবাদ

আকাশ যেমন সর্বগত হয়েও সূক্ষ্মতা হেতু অন্য বস্তুতে লিপ্ত হয় না, তেমনই ব্রহ্ম দর্শন-সম্পন্ন জীবাত্মা দেহে অবস্থিত হয়েও দেহধর্মে লিপ্ত হন না।

তাৎপর্য

জল, কাদা, বিষ্ঠা আদি সব কিছুতেই বায়ু প্রবেশ করে, কিন্তু তা হলেও কোন কিছুর সঙ্গে বায়ু মিশ্রিত হয় না। তেমনই, জীবাত্মা যদিও নানা রকম শরীরে অবস্থান করে, তবুও তার সূক্ষ্ম প্রকৃতির প্রভাবে সে সব কিছু থেকে পৃথক থাকে। তাই, জীবাত্মা যে কিভাবে এই শরীরের সঙ্গে যুক্ত থাকে এবং এই শরীরের বিনাশের পর সে যে কিভাবে এই শরীর থেকে চলে যায়, তা জড় চক্ষু দিয়ে দর্শন করা সম্ভব নয়। জড় বিজ্ঞানের মাধ্যমে কেউই তা বিশ্লেষণ করতে পারে না।

শ্লোক ৩৪

যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ কৃৎস্নং লোকমিমং রবিঃ ।
ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথা কৃৎস্নং প্রকাশয়তি ভারত ॥ ৩৪ ॥

যথা—যেমন; **প্রকাশয়তি**—প্রকাশ করে; **একঃ**—এক; **কৃৎস্নম্**—সমগ্র; **লোকম্**—জগৎকে; **ইমম্**—এই; **রবিঃ**—সূর্য; **ক্ষেত্রম্**—এই দেহকে; **ক্ষেত্রী**—আত্মা; **তথা**—সেই রকম; **কৃৎস্নম্**—সমগ্র; **প্রকাশয়তি**—প্রকাশ করে; **ভারত**—হে ভারত।

গীতার গান

সূর্য যথা প্রকাশয়ে অখিল জগৎ ।
এক দেশে একা থাকি সম্রাট মহৎ ॥

হে ভারত সেইরূপ ক্ষেত্রী প্রকাশয় ।
একা একস্থানে থাকি ক্ষেত্র দেহময় ॥

অনুবাদ

হে ভারত! এক সূর্য যেমন সমগ্র জগৎকে প্রকাশ করে, সেই রকম ক্ষেত্রী আত্মাও সমগ্র ক্ষেত্রকে প্রকাশ করে।

তাৎপর্য

চেতনা সম্বন্ধে নানা রকম মতবাদ আছে। এখানে *ভগবদ্গীতায়* সূর্য ও সূর্যরশ্মির উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। সূর্য যেমন এক জায়গায় অবস্থিত, কিন্তু তার রশ্মি সারা জগৎকে আলোকিত করছে, তেমনই অণুসদৃশ জীবাত্মা যদিও শরীরের হৃদয়ে অবস্থিত, তবুও চেতনার দ্বারা সে সমস্ত শরীরকে আলোকিত করছে। এভাবেই আমরা দেখতে পাই যে, সূর্যরশ্মি বা আলোক যেমন সূর্যের অস্তিত্বের প্রমাণ, তেমনই চেতনা হচ্ছে আত্মার অস্তিত্বের প্রমাণ। দেহে যখন আত্মা থাকে, তখন সারা শরীর জুড়ে চেতনা থাকে, কিন্তু দেহ থেকে আত্মা যখনই চলে যায়, তখন আর চেতনা থাকে না। যে কোন বুদ্ধিমান মানুষ এটি সহজেই হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন। সুতরাং, জড় পদার্থের সমন্বয়ের ফলে চেতনার উদ্ভব হয় না। চেতনা হচ্ছে জীবাত্মার লক্ষণ। জীবের চেতনা যদিও পরম চেতনার সঙ্গে গুণগতভাবে এক, তবুও তা পরম নয়। কারণ একটি দেহের চেতনা অন্য দেহের চেতনার অংশীদার হতে পারে না। কিন্তু জীবের বন্ধুরূপে যে পরমাত্মা প্রতিটি জীবের দেহে বিরাজ করছেন, তিনি সমস্ত শরীর সম্বন্ধে সচেতন। সেটিই হচ্ছে বিভুচৈতন্য ও অণুচৈতন্যের মধ্যে পার্থক্য।

শ্লোক ৩৫

ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োরেবমন্তরং জ্ঞানচক্ষুষা ।
ভূতপ্রকৃতিমোক্ষং চ যে বিদুর্যান্তি তে পরম্ ॥ ৩৫ ॥

ক্ষেত্র—দেহ; **ক্ষেত্রজ্ঞয়োঃ**—ক্ষেত্রজ্ঞের; **এবম্**—এভাবে; **অন্তরম্**—ভেদ; **জ্ঞানচক্ষুষা**—জ্ঞানচক্ষুর দ্বারা; **ভূত**—জীবের; **প্রকৃতি**—জড়া প্রকৃতি থেকে; **মোক্ষম্**—মুক্তি; **চ**—ও; **যে**—যাঁরা; **বিদুঃ**—জানেন; **যান্তি**—প্রাপ্ত হন; **তে**—তাঁরা; **পরম্**—পরম পদ।

গীতার গান

ক্ষেত্র আর ক্ষেত্রজ্ঞের তত্ত্বজ্ঞান চক্ষে ।
দেখিবার শক্তি হয় সে যাহার পক্ষে ॥
এক ক্ষেত্রজ্ঞ সে জীব অন্য পরমাত্মা ।
উভয়ের ক্ষেত্রে বাস ক্ষেত্র বিশেষাত্মা ॥
তার মোক্ষ জড়নিষ্ঠ প্রবৃত্তি হইতে ।
সুখে বাস পরব্যোমে জড় দেহ অন্তে ॥

অনুবাদ

যাঁরা এভাবেই জ্ঞানচক্ষুর দ্বারা ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের পার্থক্য জানেন এবং জড়া প্রকৃতির বন্ধন থেকে জীবগণের মুক্ত হওয়ার পন্থা জানেন, তাঁরা পরম গতি লাভ করেন।

তাৎপর্য

এই ত্রয়োদশ অধ্যায়ের মূল কথা হচ্ছে যে, ক্ষেত্র (শরীর), ক্ষেত্রজ্ঞ (শরীরের মালিক) ও পরমাত্মার মধ্যে পার্থক্য সম্বন্ধে অবগত হওয়া উচিত। অষ্টম থেকে দ্বাদশ শ্লোকে বর্ণিত মুক্তি লাভের পন্থা সম্পর্কে অবহিত হতে হবে। তবেই পরম গন্তব্যস্থলের দিকে অগ্রসর হওয়া যাবে।

যে মানুষের হৃদয়ে শ্রদ্ধার উদয় হয়েছে, তাঁকে সর্ব প্রথমে সাধুসঙ্গে ভগবানের কথা শ্রবণ করতে হবে এবং এভাবেই ধীরে ধীরে তিনি দিব্যজ্ঞান লাভ করবেন। যদি কেউ সদ্‌গুরুর চরণাশ্রয় গ্রহণ করেন, তা হলে তিনি জড় এবং চেতনের পার্থক্য নিরূপণ করতে সমর্থ হন এবং সেটিই হচ্ছে তাঁর পারমার্থিক উপলব্ধির পথে ক্রমোন্নতির উপায়। সদ্‌গুরু তাঁর শিষ্যকে নানা রকম সদুপদেশ দান করে জড়-জাগতিক জীবনের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার শিক্ষা দান করেন। যেমন, *ভগবদ্‌গীতায়* আমরা দেখতে পাই, শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে জড়-জাগতিক বন্ধন থেকে মুক্ত করবার জন্য উপদেশ দিচ্ছেন।

এই দেহ যে জড় পদার্থ তা সহজেই উপলব্ধি করা যায়; চব্বিশটি বিভিন্ন তত্ত্ব দিয়ে তার বিশ্লেষণ করা যায়। দেহ হচ্ছে তার স্থূল প্রকাশ। তার সূক্ষ্ম প্রকাশ হচ্ছে মন ও বুদ্ধির ক্রিয়া। এই সমস্ত তত্ত্বের পারস্পরিক ক্রিয়া হচ্ছে জীবনের লক্ষণ। কিন্তু এদের ঊর্ধ্বে রয়েছে আত্মা ও পরমাত্মা। আত্মা ও পরমাত্মা হচ্ছেন দুজন। জড় জগতের সমস্ত ক্রিয়া সাধিত হচ্ছে আত্মা ও চব্বিশটি তত্ত্বের

সংযোগের ফলে। যিনি আত্মা ও জড় উপাদানের সমন্বয়কে জড় জগতের কারণরূপে উপলব্ধি করতে পারেন এবং পরমাত্মার অবস্থান দর্শন করতে পারেন, তিনি চিৎ-জগতে ফিরে যাওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেন। এগুলি গভীরভাবে মনোনিবেশ ও উপলব্ধি করবার বিষয় এবং সকলেরই উচিত সদ্‌গুরুর কৃপার প্রভাবে এই অধ্যায়কে পূর্ণরূপে উপলব্ধি করা।

ভক্তিবেদান্ত কহে শ্রীগীতার গান ।
শুনে যদি শুদ্ধ ভক্ত কৃষ্ণগত প্রাণ ॥

ইতি—'প্রকৃতি-পুরুষ-বিবেকযোগ' নামক শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য সমাপ্ত।